অভিবাসীর অকথিত গল্প

স্বপ্ন ও বাস্তবতা

সম্পাদনা

তাসনিম সিদ্দিকী

অভিবাসীর অকথিত গল্প
স্বপ্ন ও বাস্তবতা

সম্পাদনা
তাসনিম সিদ্দিকী

অভিবাসীর অকথিত গল্প
স্বপ্ন ও বাস্তবতা

সম্পাদনা
তাসনিম সিদ্দিকী

RMMRU

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু)
সাত্তার ভবন (৪র্থ তলা)
১৭৯, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮৩১৩৫৬০
ই-মেইল: info@rmmru.org
ওয়েবসাইট: www.rmmru.org

প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৯

স্বত্ব © রামরু: ২০১৯

সকল অধিকার সংরক্ষিত। প্রকাশকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনা বা এর কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ বা পুনঃব্যবহার করা যাবে না। প্রকাশনার সাথে সম্পর্কিত যে কোনো অ-অনুমোদিত কার্যকলাপের জন্য ফৌজদারি মামলা এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালনায় 'ইউকেএইড'-এর সহযোগিতায় 'প্রকাশ' প্রকল্পের সহায়তায় বইটি প্রকাশিত হলো। বইটিতে প্রকাশিত মতামতের দায়ভার শুধুমাত্র লেখকদেরই। এখানে ইউকেএইড, প্রকাশ এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

ISBN: 978-984-34-4552-0

প্রকাশক: সি আর আবরার, রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভ্‌মেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ঢাকা।

প্রচ্ছদ, অলংকরণ ও মুদ্রণ: পাথওয়ে (pathway.com.bd)

সহযোগী সম্পাদক
ইফ্‌ফাত জাহান

গবেষণা সহযোগী
জোল টুরেনবাগ
কিরান স্টিভেনস
জ্যাকারী ব্রাবাজোন
বিলকিস সুলতানা
রাবেয়া নাসরীন

অনুবাদক
মোস্তফা মীর

সূচিপত্র

	টীকা ভাষ্য ও আদ্যক্ষর সমষ্টির বিবরণ	viii
	মুখবন্ধ	xi
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	উপসাগরীয় দেশগুলিতে অভিবাসন	৯
তৃতীয় অধ্যায়	অন্যান্য আরব দেশগুলিতে অভিবাসন	৭৫
চতুর্থ অধ্যায়	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন	৯৫
পঞ্চম অধ্যায়	পূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন	১১৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	দক্ষিণ এশিয়ায় অভিবাসন	১২১
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	১২৭
পরিশিষ্ট	গ্রন্থ পর্যালোচনা	১৩১

টীকা ভাষ্য ও আদ্যক্ষর সমষ্টির বিবরণ

আরপিডিও (RPDO): রুরাল পূওর ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। টাঙ্গাইলের একটা এনজিও

ইউএসডি (USD): ডলার-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা

উপজেলা: স্থানীয় সরকার কাঠামোয় জেলার নিচের স্তরের ভৌগলিক ও প্রশাসনিক কাঠামো।

এইডি (AED): দিরহাম-সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুদ্রা

এমআরপিসি (MRPC): মাইগ্র্যান্ট রাইট্স প্রোটেকশন কমিটি (অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি)। ইউনিয়ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে রামরু এই কমিটি গঠন করে। এই কমিটির কাজ হচ্ছে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা।

এমওয়াইআর (MYR): রিঙ্গিত-মালয়েশীয় মুদ্রা

এসএআর (SAR): রিয়াল-সৌদি আরবের মুদ্রা

এসজিডি (SGD): ডলার-সিঙ্গাপুরের মুদ্রা

এসএসসি (SSC): সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট

ওএমআর (OMR): রিয়াল-ওমানীয় মুদ্রা

জিএফএমডি (GFMD): গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট

জেওডি (JOD): জর্ডানের মুদ্রা

ঠিকাদার: সরবরাহকারী বা জোগানদার

ডিইএমও (DEMO): ডিসট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ম্যানপাওয়ার অফিস। বিদেশে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ও বিদেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী ও দেশে তাদের পরিবার-পরিজনকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে কাজ করে থাকে। এটি 'বিএমইটি'র অধীনে জেলা পর্যায়ের অফিস।

দালাল: এ শব্দের বেশ কিছু প্রচলিত ইংরেজি শব্দও রয়েছে। যেমন– ব্রোকার, এজেন্ট ইত্যাদি। এই বইটিতে দালাল বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা বিভিন্ন "রিক্রুটিং এজেন্সি"র হয়ে মাঠ পর্যায় থেকে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক লোক- সংগ্রহের কাজ করে।

বিডিটি (BDT): টাকা-বাংলাদেশী মুদ্রা

বিকাশ (B-Kash): মোবাইল ফোনের একটি এ্যাপলিকেশন বা এ্যাপস। এর মাধ্যমে দেশের ভেতরে টাকা আদান-প্রদান করা যায়।

বিএমইটি (BMET): ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং (জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো)। এটি অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত সরকারি এজেন্সি

রামরু (RMMRU): রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট। প্রতিষ্ঠানটি অভিবাসন বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং মাঠপর্যায়ে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও সেবাদানের কাজে নিয়োজিত।

সিসিডিএ (CCDA): সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স। কুমিল্লার একটা এনজিও

সোনার মানুষ পুরস্কার: রামরু প্রণীত জাতীয় পর্যায়ের একটি পুরস্কার। এই পুরস্কার সেইসব অভিবাসী ও তাদের পরিবারকে দেয়া হয়ে থাকে যারা রেমিটেন্সের আয় দিয়ে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করে বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখে।

হুন্ডি (Hundi): অর্থ বা রেমিটেন্স পাঠানোর অনিয়মিত পদ্ধতি

সহযোগী সম্পাদক ও গবেষণা সহযোগীদের পরিচিতি

ইফ্ফাত জাহান: ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রামরুতে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে 'এ্যাসারটিং মাইগ্র্যান্টস রাইটস' প্রকল্পে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন ও বাস্তবতা বইটির বাংলা অনুবাদ সম্পাদনার সাথে যুক্ত আছেন। তিনি রামরু'র 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসন আইন-২০১৩' বিষয়ে আইনজীবী এবং উন্নয়নকর্মীদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করেছেন।

কিরান স্টিভেনস: "গ্লোবাল এ্যাফেয়ার্স কানাডা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম"-এর অংশ হিসেবে রামরুতে ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করছেন। কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

জ্যাকারী ব্রাবাজোন: কানাডীয় ছাত্র এবং এই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের সময় তিনি রামরুতে ইন্টার্ন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কানাডার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

জোল টুরেনবার্গ: কুইন এলিজাবেথ স্কলার এবং ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের "সেন্টার ফর এশিয়া প্যাসিফিক ইনিশিয়েটিভস"-এর পক্ষ থেকে রামরুর সঙ্গে ২০১৬ সালে ইন্টার্ন করেন। তিনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতক।

বিলকিস সুলতানা: রামরুতে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি একজন দক্ষ প্রশিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

রাবেয়া নাসরীন: রামরু'র প্রকাশ প্রকল্পে ২০১৬ থেকে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি রামরু'র জাস্টিস অ্যাট দি ডোর স্টেপস: মেডিয়েশন অন মাইগ্রেশন ফ্রডিউলেন্স গ্রন্থ এবং মাইগ্রেশন ডিসপিউটস মেডিয়েশন ম্যানুয়াল প্রকাশনায় গবেষণা সহযোগী এবং বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ ২০১৭" প্রকাশনায় সহলেখক হিসেবে কাজ করেছেন।

মুখবন্ধ

"*অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন ও বাস্তবতা*" প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে। বইটি প্রকাশের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অনেকেই রামরুকে অনুরোধ করেছেন বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে। আমরা বাংলা অনুবাদটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত।

রামরুর জন্ম ১৯৯৫ সালে আর সংগঠনটি শ্রম অভিবাসন নিয়ে কাজ শুরু করে ১৯৯৭ সালে। অভিবাসীর অধিকার, অভিবাসনে সুশাসন, নারী অভিবাসন, রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা, বিশ্বায়নের বিভিন্ন সঙ্কটের মুখে অভিবাসী, যুদ্ধাবস্থায় অভিবাসী, আন্ত:সীমান্ত অভিবাসন, অনিয়মিত অভিবাসন, সমুদ্র পথে অভিবাসন বিষয়ে গবেষণা, পলিসি অ্যাডভোকেসি বা মাঠ পর্যায়ে অভিবাসীদের সংগঠিত করতে যেয়ে দীর্ঘ ২২ বছরে বহু নারী ও পুরুষ অভিবাসীর সুখ দুঃখের গল্প রামরু'র কাছে জমা হতে থাকে। এদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই আমরা বই লিখেছি, প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু গবেষণার থাকে নিজস্ব কাঠামো, নিজস্ব হাইপোথেসিস প্রমাণ বা অপ্রমাণের চেস্টা, নিজস্ব যুক্তি তর্ক। সে সব লেখায় অনেক সময় অভিবাসীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। না চাইলেও তারা পরিণত হয় কিছু পরিসংখ্যানে। ভেতরকার দায়বোধ থেকে অনেক দিন ধরেই চাইছিলাম তাদের কণ্ঠে তাদের বিচারে তাদের অভিবাসন অভিজ্ঞতা তুলে ধরব। এই চিন্তার ফসল হচ্ছে এই বই *অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন ও বাস্তবতা*। প্রায় দশ হাজার কেইস স্টাডি থেকে ১৫০টি বেছে নিয়ে সাজিয়েছি এই বই।

তাদের অভিবাসন অভিজ্ঞতায় যেমন রয়েছে রোমাঞ্চ, তেমনি রয়েছে খাঁটি করুণ বাস্তবতা। এতে যেমন রয়েছে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির গল্প; তেমনি রয়েছে তাদের বিপর্যস্থতার দুঃখ। এই বইয়ের মাধ্যমে ১২ বছর কুয়েতে থাকা সেই জামিলাকে তুলে ধরতে চেয়েছি, যে বলতে পারে, 'অভিবাসনের মাধ্যমে আমার মাঝে এক নতুন আমি তৈরি হয়েছে'; সেই ফরিদুর রহমানকে সম্মান করতে চাই যে বলতে পারে, 'আমি জিরো থেকে হিরো হয়েছি'। তুলে ধরতে চাই এমন অনেকের কথা যারা বলেছেন 'ঋণী থেকে হয়েছি ধনী','অভিবাসনের পরে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি','যাই ধরেছি সোনা হয়ে গিয়েছে'। সকলকে জানাতে চাই বেলাল হোসেনের দৃঢ় কণ্ঠস্বর যে জানিয়েছে,'দারিদ্র আমাকে আর পরাজিত করতে পারে না', বা পরিচিত করতে চাই মোহাম্মদ ইদ্রিসের সাথে যে বলেছে, 'সৌদি গেলাম, সিঙ্গাপুর গেলাম কিন্তু সফলতা এলো এই পোড়া বাংলাদেশে', আর সেই নাসিরুল হকের কথা যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় বাঙ্গালীর গভীর রসবোধ, 'ছিলাম ট্রাবল মেকার হলাম মানি মেকার'।

যে সব প্রবন্ধ আমরা সচরাচর লিখি তা কি কখনো তুলে ধরতে পারে সেই রাশেদার আকুতি যে বলেছিল, 'কোথাও শান্তি পাইনি, না দেশে, না ওমানে'। ইমরান আলীর বাস্তবতা কি করে আনব আমাদের গবেষণা প্রকাশনায় যখন সে বলে, 'অভিবাসন আমাকে গড়েছে আবার অভিবাসনই আমাকে ভেঙ্গেছে' বা মর্জিনার সেই উক্তি পাঠককে সাড়া দেবেই যখন সে বলে, 'আমি ফিরে এসেছি শূন্য হাতে, অনেক কষ্টে ভরা ভারী বুকে'। আমাদের এই বাংলাদেশের নারীই বলতে পেরেছে 'আমি কাজের জন্য বিদেশে এসেছি, শোওয়ার জন্য না'। প্রাপ্তিকে আমরা একেক

জন একেক ভাবে বিচার করি। ১৯৯৯ এ সুলতানা বলেছিল, 'মুসলমান হয়ে জন্মেছিলাম কিন্তু কোরান পড়াটাও শেখায়নি কেউ, আমার গৃহকর্ত্রী আমাকে কোরান পড়া শেখান, এই তৃপ্তি রাখবো কোথায়? নারীর ক্ষমতায়ণ কোন পর্যায়ে যখন মোমেনা বলে,'অযোগ্য স্বামীর কথা রাখার চেয়ে সন্তানের উন্নতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ-বিয়ে থাকুক বা না থাকুক'।

সেই হাহাকার কি কোন গবেষণা ধরতে পারে, যখন মোহাম্মদ জব্বার আলী বলছে, 'চারিদিকে শুধু ঠকবাজ'। ধীরেন্দ্র সূত্রধরের কণ্ঠ পাঠককে শোনাতে চাই, 'ছেলের লাশটাও পোড়াতে পারি নাই'। কতজন যে বলেছে, 'অভিবাসন আমাকে বিপর্যস্থ করেছে', 'আমি যা হারিয়েছি তা জীবনে আর ফিরে পাবার নয়'। মোহাম্মদ হেলালের সামান্য চাওয়া নীতি নির্ধারকদের শোনাতে চাই, 'খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে, মিলিশিয়াদের গুলির নিচে পড়ে আমি লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছি, আমি কম্পেনসেশন চাইনা, আমি একটি কাজ চাই'। অথবা সেই ইরাক প্রত্যাবর্তিত কর্মীর কথা যখন সে বলেছিল, 'আমি স্থল পথে গাড়ি চালিয়ে ইরাক কুয়েত যুদ্ধের সময় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, আমার কাছে কিছুই আর অসম্ভব মনে হয়না'। জানিয়ে দিতে চাই, সাদেকুল হোসেনের স্বপ্ন দেখার শক্তি, 'যত বাঁধাই আসুক, আমি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করি নাই'। রাশেদা, জব্বার আলী, সাদেক, জামিলাদের অকথিত গল্পগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা রচনা করেছি এই গ্রন্থ।

অভিবাসীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সম্মান রেখে এ বইতে আমরা তাদের নাম বদলে দিয়েছি। এসব অভিজ্ঞতার গল্প রামরু'র নিজস্ব সংগ্রহ। শুধু সমুদ্রপথে অভিবাসন সংক্রান্ত কক্সবাজারের দুটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে (প্রথম আলো)।

এই বইটির ইংরেজি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। বইটির দ্বিতীয় ইংরেজি সংস্করণ এবং এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় ২০১৮ সালে। বাংলা সংস্করণকে পুরোপুরি অনুবাদ বলা চলে না কারণ বইটি পাঠযোগ্য করার জন্য মুখবন্ধ ও ভূমিকাতে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একই সাথে গ্রন্থ পর্যালোচকদের মন্তব্য অনুযায়ী এতে একটি উপসংহার যুক্ত করা হয়েছে। এ বইটি একটা দলগত প্রচেষ্টার ফল। রামরু'র মাঠ কর্মী, গ্রাম পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান অভিবাসী অধিকার সুরক্ষা কমিটি (এমআরপিসি)'র সদস্যবৃন্দ এবং গবেষকদের সম্মিলিত চেষ্টায় গল্পগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। রামরু'র ঢাকা অফিসের কর্মী ও ইনটার্নরা সংগৃহীত গল্পগুলি পড়েছে, সেসব গল্পের সত্যতা পরীক্ষা করেছে এবং তারপর গল্প নির্বাচন করেছে। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

একইসাথে আমি সেইসব অভিবাসী ও তাদের পরিবারকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছে। সাহসের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে ভাগাভাগি করেছে। সেইসব অভিবাসীকেও ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের সাফল্যের কাহিনী লিখে পাঠিয়েছে। এ ছাড়াও আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি, যার মাধ্যমে এসব গল্পগুলো সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলোতে সহায়তা দেয়ার জন্য আমি কিছু প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই: তারা হলো প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ইউকেএইড, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও), ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম), সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং মাইগ্র্যান্ট ফোরাম ইন এশিয়া (এমএফএ)। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই জনাব মোস্তফা মীরকে। "*অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন ও বাস্তবতা*" বইটি তিনি পাঠযোগ্য করে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই রামরু'র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মেরিনা সুলতানাকে, শত কাজের মাঝে সে নিরলসভাবে লেগে থেকে আমার কাছ থেকে এই বই সম্পাদনের কাজটি আদায় করে নিয়েছে।

বৃটিশ কাউন্সিলের 'প্রকাশ' প্রকল্পটির প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ প্রকল্পের সে-সময়ের দলনেতা, ক্যাথরিন সেসিল এবং হেড অফ প্রোগ্রাম, তানভীর মাহমুদকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আরও ধন্যবাদ জানাই আইবিপি ম্যানেজার শিরিন লিরাকে বাংলা অনুবাদে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য।

তাসনিম সিদ্দিকী

জানুয়ারি ২০১৯

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

"*অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন ও বাস্তবতা*" বইটি তুলে ধরেছে একশ পঞ্চাশ জন বাংলাদেশি অভিবাসীর জীবন ও কর্মের গল্প। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অভিবাসীত হয়েছিলেন। বইটি প্রকাশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অভিবাসীদের নিজেদের মুখ থেকে তাদের অভিবাসী-জীবনের অভিজ্ঞতার গল্পগুলো শোনা। এসব অভিবাসীর সঞ্চয়ে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার অভিজ্ঞতা। তাদের বলা গল্পগুলো অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রায় সবগুলি পর্ব বা পর্যায়কেই স্পর্শ করেছে। অভিবাসনের আগের অবস্থা, অর্থাৎ অভিবাসনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে অভিবাসন পরবর্তী পুনঃএকত্রীকরণ পর্যন্ত–সবই। পুরুষের পাশাপাশি নারী অভিবাসীদের অভিজ্ঞতাও বইটিতে আছে। অকথিত ৩৭টি গল্প হচ্ছে নারী অভিবাসীর এবং বাকি ১১৩টি হলো পুরুষ অভিবাসীর। এদের একেক জনের অভিবাসন-অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর বা ভয়ংকর গল্পগুলি একেক রকমের।

কারো গল্প দুঃসাহসিকতা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ। কারো গল্প আমাদের শোনায় দারিদ্র্যের শেকল ভাঙার গান। জীবনসংগ্রামের চড়াই উতরাইয়ের কবিতা। অভিবাসন কাউকে নিয়ে গেছে সাফল্যের শীর্ষে। কাউকে নামিয়ে এনেছে হতাশার অতল তলে। আবার কোন কোন অভিবাসীর অভিজ্ঞতা আমাদের পরিচিত করেছে তাদের সনাতন মূল্যবোধকে অতিক্রম করার সক্ষমতার সাথে। পাশাপাশি অভিবাসনের অন্ধকার দিকগুলিও উন্মোচিত হয়েছে তাদের গল্প থেকে। বহু অভিবাসীর নিঃস্ব হবার করুণ কাহিনী আছে এতে। কতজন যে হারিয়েছে ঘরবাড়ি ও কৃষিজমি; আর সম্পদহানির গল্পতো আছেই। অনেকের কাহিনীই প্রতারণা ও ভাওতাবাজিতে পরিপূর্ণ। কোথাও বা কাজ ও জীবনযাপনের পরিবেশ অমানবিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিবাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুরও কারণ।

বেশ কিছু গল্পে উঠে এসেছে নারীর ক্ষমতায়ন। দেখা গেছে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে নারী সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, কঠোর পরিশ্রম করেছে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এবং তাদের পাঠানো রেমিটেন্স সন্তানদের লেখাপড়ার মান গুনগতভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি নারীর ব্যর্থতার কাহিনীও রয়েছে। অনেকেই শিকার হয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনের। অভিজ্ঞতা রয়েছে কর্মক্ষেত্রে অমর্যাদার। না খেয়ে, অর্ধপেট খেয়ে থেকেছে বহুদিন। কিছু কিছু নারী হারিয়েছে মানসিক ভারসাম্য।

গল্পগুলো অভিবাসীদের নিজেদের ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। তাদের কাহিনীগুলোতে কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা হতে কিছু সামান্যিকরণ সম্ভব। যেমন, অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনের কারণগুলি, অভিবাসনের কাল, অভিবাসনের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, অভিবাসন হতে যা উপার্জিত হয়েছে এবং অভিবাসনের লাভ ক্ষতির হিসেব ইত্যাদি। প্রথমে আসা যাক কেন এই অভিবাসন সে প্রসঙ্গে।

কেন এই অভিবাসনের স্বপ্ন?

বেশিরভাগ অভিবাসী অর্থনৈতিক কারনকেই অভিবাসনের প্রধান চালিকাশক্তি বলে মনে করে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ব্যবসায়ে ক্ষতি, ইত্যাদি থেকে উদ্ধার পেয়ে বেশি উপার্জন ও নিশ্চিত স্বচ্ছল জীবনের স্বপ্নই অভিবাসনের মূল কারণ– এমন কথাই উঠে এসেছে বারবার তাদের গল্পে। অনেকেই তাদের সনাতন পেশা যেমন: তাঁতবোনা, মাছধরা, ইত্যাদির চাহিদা কমে যাওয়ার কারণেও অভিবাসী হয়েছেন বলে জানান।

সামাজিক ও জনতাত্ত্বিক কারণগুলোর দিকেও ইঙ্গিত করেছে অনেকে। পরিবারের দায়িত্ব প্রায়শই বড় ছেলে বা মেয়ের ওপরে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হলে সেই পরিবারের বড় ছেলে বা মেয়ের জন্য অভিবাসন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্কুল থেকে ঝরে পড়া উঠতি বয়সের সন্তানের বাবা-মা তাদেরকে বিদেশে পাঠাতে বেশি আগ্রহী হয়। কারণ তারা মনে করে অলস ও কর্মহীন থাকলে তাদের সন্তান কু-সঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। বরং বিদেশে পাঠালে টাকাও আয় করবে সন্তানও ভালো থাকবে। অনেকেই পরিবার থেকে রোজগারের চাপ অথবা দেশে চাকরি না পাওয়ার বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে অভিবাসী জীবন বেছে নেয়। আবার অনেকে নতুন একটা দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করতেও অভিবাসী হয়। অভিবাসনের মধ্যে একটা নতুন স্বচ্ছল জীবনের হাতছানি দেখে। নতুন দেশে, অর্থনৈতিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, নতুন সংস্কৃতি, নতুন পরিবেশের অভিজ্ঞতা করতে চায় অনেকে।

অভিবাসনের খোঁজ খবর প্রাপ্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া অনেকেই বিদেশে থাকা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশীদের অনুসরণ করে অভিবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদের মাধ্যমে তথ্য জোগাড় করেন। এমনকি কাজের সুযোগও পান। বর্তমানে সামাজিক নেটওয়ার্কের কারণে অভিবাসন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া রয়েছে স্থানীয় দালাল। অনেক সময় দালালরা পরিবারগুলোকে রাজী করাতে অভিবাসনের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে অতিরঞ্জিত স্বপ্ন দেখায়। দালালের কথায় প্রলোভিত হয়ে বাবা-মা দেশে কাজ পাচ্ছে না, বা কাজ করছে না-এমন সন্তানদের বিদেশ পাঠাবার প্রস্তুতি নেয়। দালালের প্ররোচনার কুফল ব্যাপকভাবে উন্মোচিত হয়েছে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া অভিবাসনের ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে। দালালরা সিরাজগঞ্জের গরিব বেকার তাঁতকর্মীদেরকে প্রলুব্ধ করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, বিদেশে কাজ পেতে অভিবাসন খরচ হবে মাত্র বাংলাদেশী ১০,০০০ টাকা। পূর্বাপর না ভেবে অনেকেই বিদেশের পথে পাড়িও জমায় এবং প্রতারিত হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, 'যোগাযোগ' অভিবাসীর জন্য ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ফলাফলই বয়ে আনতে পারে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও পরিবেশগত কিছু কারণও রয়েছে যা অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নদী ভাঙনের কারণে ভূমি হারানো, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, খরা ইত্যাদির কারণে চাষবাসের সুযোগ কমে যাওয়া কারো কারো ক্ষেত্রে অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে।

অভিবাসনের সময়সীমা, খরচ এবং উপার্জন

এই বইতে যাদের গল্প বলা হয়েছে তারা ১৯৮০ দশকের শেষদিক থেকে শুরু করে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অভিবাসন করেছে। পুরুষদের শতকরা ১৮ ভাগ অভিবাসন করেছে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে। শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ পুরুষ অভিবাসী হয় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ এর মধ্যে। অভিবাসনের এসব কাহিনীর শতকরা দশ ভাগেরও বেশি ঘটে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের ভেতরে এবং আরও শতকরা ১০ ভাগ ঘটে ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে। শতকরা ২০ ভাগেরও কিছু কম অভিবাসন ঘটে ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে। তবে সবচেয়ে বেশি, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ পুরুষ অভিবাসী হয় ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে।

বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ আধা-দক্ষ নারীর আন্তর্জাতিক অভিবাসনের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল ২০০৩ সাল পর্যন্ত। সে কারণে, ২০০৩ সালের আগে নারীরা খুব একটা অভিবাসন করত না। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর নারীরা আর্ন্তজাতিক অভিবাসনে অংশগ্রহন করতে শুরু করে। তবে বিষয়টা এমন না যে ২০০৩ সালের আগে নারীরা কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যায়নি। এ বইয়ের গল্পগুলির মধ্যে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ নারী বিদেশে অভিবাসী হয়েছিলো ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সালের ভেতরে। অর্থাৎ তারা বিদেশ গিয়েছিলো অবৈধ পথে। শতকরা সাত ভাগ বিদেশ গিয়েছিল ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে। আরও শতকরা ৩৬ ভাগ অভিবাসী হয়েছে ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের ভেতরে। সবচাইতে বেশি নারী অভিবাসী হয় ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে। এই বইয়ে ৩৭ জন নারী অভিবাসীর গল্প রয়েছে, যাদের শতকরা ৪৬ ভাগ অভিবাসী হয়েছে এই সময়ে অভিবাসন সংক্রান্ত যেকোনো গবেষণায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয় সকলেরই বিশেষ উদ্বেগের কারণ। সাধারণ যুক্তি অনুযায়ী এটা ভাবা স্বাভাবিক যে, গরিব মানুষ যখন আয়ের জন্য বিদেশ যাবে, তখন তারা কেন কাজ পেতে পয়সা খরচ করবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বিদেশ যেতে চাইলে "ওয়ার্ক পারমিট" সংগ্রহ করতে তাদের মোটা অংকের টাকা খরচ করতে হয়। সাধারণভাবে একেই আমরা অভিবাসন ব্যয় বলে থাকি।

বইটির গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাথমিকভাবে পুরুষের অভিবাসন খরচ নারীর অভিবাসন খরচের প্রায় দ্বিগুণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুরুষ অভিবাসনের খরচ বেড়ে প্রায় চারগুণ হয়েছে। পুরুষ অভিবাসীরা ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত খরচ করত ৬৮ হাজার টাকা। এই খরচ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে খুব একটা বাড়েনি। সেই সময় গড়ে প্রায় ৭১ হাজার টাকা খরচ হতো। ১৯৯৬ সালের পর পুরুষের অভিবাসন খরচ নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। অভিবাসীরা ১৯৯৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত খরচ করত গড়ে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এরপর ২০০৬ থেকে ২০১০ সালে খরচ বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। সবশেষ ২০১১ থেকে ২০১৫ সালে অভিবাসন খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

একশ তের জন পুরুষ অভিবাসীর আয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, বহুবছর ধরে অভিবাসনে থাকার পরও পুরুষ অভিবাসীদের উপার্জন তেমন বাড়েনি। নব্বই দশকের শুরুর দিকে কম দক্ষ

একজন পুরুষ অভিবাসী প্রতি মাসে আয় করত গড়ে ২০ হাজার টাকা। ২০১৫ সালে গড় আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার টাকা। অন্যদিকে নব্বই দশকের শুরুর দিকে নারী অভিবাসীরা প্রতি মাসে আয় করত ৬ হাজার টাকা। কিন্তু ২০১১ থেকে ২০১৫ সময়সীমায় তাদের মাসিক আয় বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে ১৪ হাজার টাকা। তবে মনে রাখা দরকার যে, অনেক অভিবাসীই কিন্তু নিয়মিত বেতন পায় না, কেউ কেউ কোনো বেতনই পায় না। আবার অনেকেই অতিরিক্ত কাজ করে বাড়তি টাকা আয় করে।

সফল অভিবাসন

অভিবাসীদের গল্পগুলো থেকে দেখা যায় যে, অভিবাসন বেশ কিছু কর্মীর জন্য বিভিন ধরনের সাফল্য বহন করে এনেছে। তাদের অনেকেই স্থায়ীপদে চাকরি করছে, নিয়মিত বেতন পাচ্ছে এবং পরিবারে নিয়মিত টাকাও পাঠাচ্ছে। বহু পরিবারের ক্ষেত্রে এই অর্থই উপার্জনের একমাত্র উৎস। আবার কেউ কেউ রেমিটেন্সের একটা অংশ সঞ্চয় করে আয় সৃষ্টিকারী উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছে। এ ছাড়া বেশিরভাগ অভিবাসীর প্রথম ও প্রধান স্বপ্ন হলো নিজের গ্রামে অথবা কাছাকাছি শহরে জমি কেনা, নতুন বাড়ি বানানো বা পুরোনো বাড়ি সংস্কার করা। হতে পারে এই নতুন বাড়িটা পাকা অথবা আধা-পাকা, একতলা কিংবা বহুতলা। অনেক অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের জন্য কৃষিজমি বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায় এমন জমি কিনেছে। ফিরে আসা কিছু অভিবাসী বিনিয়োগ করেছে বাজার, দোকান অথবা শপিং-মল নির্মাণে, কেউবা কিনেছে নতুন দোকান। অভিবাসীরা প্রায়ই পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে বিদেশ পাঠাবার তাগিদ অনুভব করে থাকে। নিজে বিদেশ যেয়ে যে উপকার পেয়েছে সেই উপকারের সুযোগ অন্য সদস্যকেও দিতে চায়। এ আচরণ অভিবাসীর সাফল্যের একটা অন্যতম নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বইটির অনেক গল্পে এ ধরনের বেশ কিছু উদাহরণ আছে। কিছু অভিবাসী তাদের চাকরিদাতার কাছ থেকে অথবা খোলা বাজার থেকে কাজের ভিসা কেনে এবং তারপর তা দেশে বিক্রি করে তাদের নিজের এলাকায়। বহু অভিবাসীই বাড়তি আয়ের জন্য নিজেরাই দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিয়ে একটি ব্যয়বহুল আয়োজন। গ্রামের মানুষদেরও বিয়েতে প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হয়, কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও অনিচ্ছায়। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়েতে টাকা খরচ করার যোগ্যতাকে অভিবাসীদের সাফল্য বলে বিবেচনা করা হয়।

দেশে ফিরে আসা অভিবাসীদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছে কেউ কেউ। যদিও ব্যবসার ধরণ নির্ভর করেছে তাদের অঞ্চল ও পরিবেশের ওপর। যেমন কুমিল্লার ফেরত আসা অভিবাসীর অনেকেই মাছ চাষে টাকা বিনিয়োগ করেছে। এক দল প্রতিষ্ঠা করেছে মাছের খাবার উৎপাদনের কারখানা, আবার অন্য দল মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে বরফ কল। টাঙ্গাইলে দেখা যাচ্ছে, ফেরত আসা কয়েকজন অভিবাসী স্থাপন করেছে তাঁত কারখানা, যেখানে শাড়ি বোনা হচ্ছে। কেরাণীগঞ্জের বেশ কিছু অভিবাসী বিনিয়োগ করেছে গরুর খামারে এবং জাপান থেকে ফেরত আসা এক

অভিবাসী প্রতিষ্ঠা করেছে হাসপাতাল। একইভাবে, অভিবাসী পরিবারগুলো কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিকীকরণের জন্য কিনেছে ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার এবং স্থাপন করছে রাইস মিল। এদের কেউ কেউ বিনিয়োগ করেছে পরিবহন ব্যবসাতে। তারা বর্তমানে একাধিক পিক-আপ ভ্যান, মাইক্রোবাস, সিএনজি চালিত বেবিট্যাক্সি, টেম্পো ও রিক্সার মালিক। কোন কোন অভিবাসী তার গ্রামে কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলেছে। যদিও এটা একটা ব্যবসায়ী উদ্যোগ কিন্তু তারপরও এই স্কুল স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

সংকলিত গল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষা বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের ফলাফলই আছে। অভিবাসনের কারণে অনেককেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। আবার অসংখ্য অভিবাসী জানিয়েছে যে অভিবাসনের মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পেরেছে। কিছু অভিবাসী তাদের গ্রামীণ সমাজের মঙ্গলের জন্য সেবামূলক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। অনেকে দান করেছে স্থানীয় মসজিদের তহবিলে। আবার কেউ কেউ নির্মাণ করেছে মসজিদ। অনেকে নির্মাণ করেছে সড়ক অথবা মেরামত করেছে কাঁচা রাস্তা। যেন তাদের ও অন্যদের বাড়ির সঙ্গে কিংবা প্রধান সড়কের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা হয়। নারী অভিবাসীরা তাদের সন্তানের জন্য শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

এ বইয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লি শহরে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া কিছু দম্পতির যৌথ অভিবাসনের গল্পও রয়েছে। তাদের অকথিত গল্প ভারত ও বাংলাদেশের ভেতরে বহমান একটা সমন্বিত শ্রম বাজারের বাস্তবতাকে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। দিল্লিতে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে। সে কারণে, সে কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারেরা প্রায়ই তাদের বাংলাদেশী কর্মীদেরকে অর্থ প্রদান করে থাকে তাদের নিজ নিজ গ্রাম থেকে কম বয়সী শ্রমিক দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্য। এসব ঠিকাদারেরা তরুণ স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অভিবাসনে বেশি আগ্রহী। কারণ অভিবাসী স্ত্রী সেখানে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে পারবে। বর্জ্য সংগ্রহ করে স্বামী কম বেতন পেলেও দুজনের যৌথ উপার্জনে দিল্লি শহরে তারা টিকে থাকতে পারবে। এসব অনিয়মিত বাংলাদেশী অভিবাসী পরিবারগুলি সবসময় গ্রেফতারের ভয়ে থাকে। কখনও কখনও উচ্ছেদের ঘটনার মুখোমুখিও হতে হয়। তবু এসব দম্পতি সেখানে অবস্থান করার বিষয়টি ভালো চোখেই দেখতে চায়। কারণ সেখানে তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কাজ পাচ্ছে এবং পরিবার হিসেবে একত্রে বসবাস করার সুযোগ পাচ্ছে। অন্যান্য দেশের নারী শ্রমিকদের মতো দিল্লিতে অভিবাসী নারী শ্রমিকরা চাকরিদাতার বাড়িতে থাকতে বাধ্য নয়। সে কারণে, মৌখিক হয়রানি, মারধোর করা এবং যৌন হয়রানির উদাহরণ খুবই কম।

অভিবাসন দুর্বিপাক

এই বইতে এমন অনেক গল্প আছে যেগুলো অভিবাসনকে ক্রমবর্ধমানভাবে ঝুঁকিপূর্ণ একটা উদ্যোগ হিসেবে চিত্রিত করেছে। এ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে রয়েছে ঠকবাজি, ভাওতাবাজি ও

প্রতারণা। অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজ হলো; তথ্য প্রচার, কর্মী সংগ্রহ এবং অভিবাসন ব্যয় সংগ্রহ। এসব কাজ প্রায়ই সম্পন্ন হয়ে থাকে অনানুষ্ঠানিক দালালের মাধ্যমে। কাহিনীর পর কাহিনীতে দেখা যায়, দালাল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে অত্যধিক বেতনের, ভুল তথ্য দিচ্ছে কাজের প্রকৃতি অথবা কাজের ধরণ সম্পর্কে এবং কখনও কখনও মিথ্যা বলছে গন্তব্য দেশ সম্পর্কে।

একদল দালাল এসব অভিবাসীকে বিদেশে পাঠায় তথাকথিত 'ফ্রি-ভিসা'র মাধ্যমে। ফ্রি ভিসার অর্থ হচ্ছে যে সেই ভিসার বিপরীতে কোন কাজ সংযুক্ত নেই। অথচ দালালরা অভিবাসন ইচ্ছুকদের বোঝায় যে, এটাই ভাল ভিসা! অভিবাসী গন্তব্যে পৌঁছানোর পর নিজের পছন্দ মতো চাকরি খুঁজে নেবে। বাস্তবতা হলো 'ফ্রি-ভিসা' বলে কিছু নেই। এরকম 'ফ্রি-ভিসা'য় গন্তব্য দেশে যেয়ে মাসের পর মাস কোনো কাজ নাও পাওয়া যেতে পারে। কখনও কখনও এসব চাকরিহীন অভিবাসীকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং দেশে ফেরত পাঠানোর আগে বন্দিশিবিরে আটকে রাখে। এমনকি যেসব ভিসা একজন বিশেষ চাকুরীদাতার সাথে যুক্ত সেসব ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অনিয়ম হয়। অভিবাসী গন্তব্যদেশে পৌঁছানোর পর তাকে কম বেতনে নতুন চুক্তিতে জোর করে স্বাক্ষর করানো হয়। উপরে বর্ণিত ভিসা বিষয়ক দুটো ক্ষেত্রেই অনেকে কাজ না পেয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

নারী অভিবাসীদের অনেকেরই বিদেশে চমৎকার পরিবেশে কাজ ও জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আবার অনেকেই আছে যাদের অভিজ্ঞতা ভালো না। সব নারী অভিবাসী যাদের কাহিনী এই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এসেছে গ্রাম এলাকা থেকে এবং কারোরই তাদের ঘরের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। অভিবাসন তাদেরকে কেবল নতুন দেশের সঙ্গে পরিচিতই করায়নি, নতুন সংস্কৃতিরও মুখোমুখি করিয়েছে। খাদ্যাভ্যাস সংস্কৃতির অংশ। ফলে নতুন দেশের খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগতেই পারে। যেহেতু তারা অভ্যস্ত নয় সে কারণে অনেক সময় মনে করে তাদের চাকরিদাতা পর্যাপ্ত খাবার দিচ্ছে না। আবার এমন গৃহকর্তাও অনেক, যারা আসলেই পরিমানমত বা মানসম্মত খাবার দেয় না। বিশেষ করে নারী অভিবাসীরা বিদেশে যেয়ে সবচেয়ে বেশি ঘরকাতুরে হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু সমস্যাই কাটিয়ে ওঠা যায়।

তাদের গল্পে উঠে এসেছে নানান হৃদয়বিদারক ঘটনা। অনেক নারী অভিবাসী আছে যারা নিয়মিত বেতন পায়নি, কেউ একেবারেই পায়নি, কাউকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে, কাউকে মানসিকভাবে হেয় করা হয়েছে এমনকি কেউ কেউ শিকার হয়েছে যৌন নির্যাতনের। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব সমস্যার মুখোমুখি যারা হয়েছে তাদের কেউ কেউ চাকরিদাতার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে দূতাবাসে এবং বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে দেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা করতে। এসব কারণে নারী-অভিবাসী প্রেরণকারী কিছু দেশ তাদের নারী-অভিবাসন-সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করেছে। হয় তারা গৃহকর্মে নারী-অভিবাসন একেবারে নিষিদ্ধ করেছে অথবা কিছু কিছু গন্তব্য দেশে গৃহকর্মী হিসেবে নারীর অভিবাসন কমিয়ে এনেছে।

এটা খুবই দুঃখজনক যে, বহু অভিবাসী অভিবাসনের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনেকে মোটা অংকের টাকা প্রদান করার পরও বছরের পর বছর চেষ্টা করেও বিদেশে যেতে পারে না। এসব কাহিনীর ভেতরে আরও একটা অবাক করা তথ্য পাওয়া গেছে এবং তা হলো একজন অভিবাসী সফল হবে না ব্যর্থ হবে সেটা কোন পথে সে বিদেশ গিয়েছে তার উপর নির্ভর করে না। সাধারনত মনে করা হয় বৈধ পথে বিদেশে গেলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে একজন বৈধ অভিবাসী ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে আবার অবৈধ পথে যাওয়া একজন অনিয়মিত অভিবাসী সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুঁজে পেয়েছে সমৃদ্ধির পথ। অর্থাৎ এটা অনেক বেশি তার চাকরিদাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল।

বঙ্গোপসাগর দিয়ে অর্থ্যাৎ সমুদ্রপথে অবৈধ অভিবাসনের পরিণতি অনেকগুলো কাহিনীতে চিত্রিত হয়েছে। ইউএনএইচসিআর-এর তথ্য অনুসারে ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৮০ হাজার বর্মীয় রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী বঙ্গোপসাগর দিয়ে থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী হয়েছে। ফলে তৈরি হয়েছে, প্রতারণা, অপহরণ, মুক্তিপণ, বন্দিত্ব, নির্যাতন, মৃত্যু, এমনকি গণকবরের কাহিনী। সমুদ্রপথে যাওয়া এসব অভিবাসীদের অনেকেই দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম, এদের অনেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ। আগে এসব লোক কখনই স্বল্পমেয়াদি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ করার স্বপ্ন দেখতে পারত না। কারণ অভিবাসন করতে যে বিশাল অর্থ প্রয়োজন তা তাদের নেই। মানব চোরাকারবারীরা তাদেরকে সমুদ্রপথে অভিবাসনের প্রলোভন দেখায় এবং খরচ হিসেবে বাংলাদেশী মাত্র ১০ হাজার টাকা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাদের স্বপ্ন দেখায় সস্তায় অভিবাসনের। এসব অভিবাসীদের এ বিষয়ে কোন ধারণা না থাকায় তারা মুখোমুখি হয় মুক্তিপণের, দাসদের মতো কাজের পরিবেশের এবং মৃত্যুর। অভিবাসনে এর চেয়ে করুণ পরিণতি আর কিছু নেই। বিশ্বায়ন আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী অভিবাসীদের অংশগ্রহণের একটি বড় সাফল্যের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সাথে, এর ফলে তারা পরিচিত হয়েছে জীবন বিপন্নকারী পরিস্থিতির সঙ্গে। কিছু কাহিনী আমাদের সেই সব অভিবাসী সম্পর্কে জানায়, যারা লিবিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য। আরব বসন্তের স্ফুলিঙ্গের মুখে লিবিয়ায় গাদ্দাফি শাসন অবসানের জন্য যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এসব অভিবাসীরা পড়ে গিয়েছিল সেই যুদ্ধের মধ্যে।

অর্থের লোভে ঐ দেশের বেসামরিক মিলিশিয়ারা তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালিয়েছিল তাদের আবাসস্থল। তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের যাবতীয় সম্পদ এবং পালিয়ে গিয়েছিল তিউনিসিয়ার মতো বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশে। আশ্রয়হীন অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে তখন দিন কেটেছে তাদের। সবশেষে, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে তারা প্রত্যাবাসিত হয়েছিল। তারা ঘরে ফিরে এসেছে খালি হাতে এবং সরকার প্রতি জনকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে তাদের দুর্ভোগের জন্য। অভিবাসনের অভিজ্ঞতা তাদের জন্য সেই সুফল বহন করে আনতে পারেনি যার স্বপ্ন তারা দেখেছিল।

এসব গল্পগুলো অভিবাসন সম্পর্কে আরো কিছু মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে। অধিকাংশ অভিবাসী, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে যাদের অভিবাসনের ফলাফল খুবই ভালো, তারা চায় না পুনরায় অভিবাসন করতে। কিন্তু অভিবাসীর একটা অংশ আবার বাংলাদেশে ফিরে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। বিদেশের জীবনযাপন রীতিই তাদের অধিকতর পছন্দ। তাই তারা আবার চলে যায় বিদেশে। অন্যদিকে যে অভিবাসী প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছে প্রায়ই সে উদ্যোগ নেয় পুনরায় অভিবাসনের। তারা ভাবে যে, আগেরবারের দালালটি হয়তো খারাপ মানুষ ছিল তাই সে তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। কিন্তু এবারের দালাল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবে যারা এভাবে ভেবেছে তাদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই কারণ, অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে চতুর্থ বা পঞ্চম বারের অভিবাসনে কেউ কেউ সফল হয়েছে। আবার এখানে এমন গল্পও আছে প্রথম অভিবাসনে সফল হলেও পরবর্তী উদ্যোগগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

অভিবাসীদের গন্তব্য-দেশসমূহ বিবেচনায় রেখে গল্পগুলোকে আমরা অঞ্চলভিত্তিক অধ্যায়ে ভাগ করেছি। এগুলো হলো উপসাগরীয় দেশসমূহ, অন্যান্য আরব দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ। দ্বিতীয় অধ্যায় হতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত উপস্থাপিত হয়েছে অভিবাসীর সুখ দুঃখের গল্পগুলো, সপ্তম অধ্যায়ে টানা হয়েছে কিছু উপসংহার। এরপর পরিশিষ্টতে যুক্ত করা হয়েছে এই গ্রন্থের তিনটি পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপসাগরীয় দেশগুলিতে অভিবাসন

বাহরাইন

আর বিদেশ নয়

মোহাম্মদ মোকাম্মেল

আমি দেশে ফেরত আসা একজন অভিবাসী। অল্প বয়সে বাবা মারা যায়। আমরা চার ভাই তিন বোন। বড় ভাই বাহরাইনে কাজ করতেন। তিনিই আমাদের তিন বোনের বিয়ের খরচ দেন ও ভাইদের লেখাপড়ার খরচও দিতেন। আমি বিশ বছর বয়সে, ২০০৯ সালে, তিন লাখ বিশ হাজার টাকা খরচ করে এক বন্ধুর দেয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বাহরাইনে যাই। এই টাকা যোগাড়ের জন্য আমি আমার ভাগের জমি বিক্রি করে দেই এবং কিছু টাকা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করি। আমাদের পারিবারিক জমি খুব কম ছিল। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যা যথেষ্ট ছিল না। দেশে চাকরির অভাব থাকায় আমি বিদেশ যেতে বাধ্য হই। লেখাপড়াও বেশি জানি না। শুধুমাত্র দাখিল পরীক্ষায় পাশ করেছি। পুলিশের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম কিন্তু তারা আমার কাছে ঘুষ চায়। তখন উপলব্ধি করি যে, পুলিশের চাকরিতে ঘুষের টাকার চেয়ে কম টাকায় বিদেশ যাওয়া উত্তম সিদ্ধান্ত হবে।

যাওয়ার আগে আমার বন্ধু বলেছিল বাহরাইনে গেলে বাজারে একটা কাজ পেয়ে যাব। তবে বাহরাইনে পৌঁছানোর পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। বাহরাইনে এক বছর চাকরিহীন অবস্থায় কাটাই। ভাষা শেখার পর বাজার এলাকায় একটা চাকরি যোগাড় করতে পারি। সেখানে আমার বেতন ছিল ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। নিজের খরচ মেটানোর পর প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা পরিবারকে পাঠাতাম। সেই টাকা থেকে আমার পরিবার কিছু কিছু করে ঋণ শোধ করতে থাকে। তবে এখনও ৫০ হাজার টাকা ঋণ রয়েছে। আমি সেই বাজারে একবছর চার মাস কাজ করেছিলাম। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় দেশে ফেরত আসি। কিছুদিন পর আবার বাহরাইনে যাই এবং আগের চাকরিটাই নয় মাসের জন্য ফেরত পাই।

আমার ভিসায় কিছু সমস্যা ছিল। ফলে পুলিশ আমাকে আটক করে এবং বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। তখন সিদ্ধান্ত নেই আর বাহরাইনে ফিরে যাব না। এসময় দেশে একটা মাছের খামারে কাজের সন্ধান পাই। এরই মধ্যে, বিদেশ থেকে ফেরত আসার পরপরই আমি বিয়ে করি এবং একটা কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। মাছের খামারে কাজ করে বেশি টাকা আয় করা সম্ভব না। তাই অন্য কাজও খুঁজতে থাকি। এ সময় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রামরু'র মাধ্যমে ড্রাইভিং শেখার একটা সুযোগ পেয়ে যাই। আমার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝতে পেরেছি যে, নির্দিষ্ট কোনো দক্ষতা থাকলে সহজেই বেশি টাকা আয় করা সম্ভব। আমি বাংলাদেশে ড্রাইভার হিসেবে একটা কাজ যোগাড়ের চেষ্টা করবো। আশা আছে একদিন আমি একটা গাড়ি কিনব এবং আরো বেশি আয় করবো। আর বিদেশ না!

বাহরাইনে আমার দিন যায়, নতুন কাজ খোঁজার ধান্দায়

আবদুল হাসান

আমার নাম আবদুল হাসান। গাজীপুরের টঙ্গিতে আমার বসবাস। আমার স্ত্রী গ্রামে থাকে। অভিবাসনের আগে আমার স্ত্রী গ্রামে একটা মুদির দোকান দেবার জন্য একটা এনজিও থেকে টাকা ঋণ নেয়। সেই দোকান চালাতে গিয়ে আমি বহু ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই। লোকজন প্রায়ই বিভিন্ন জিনিসপত্র বাকিতে নেয় কিন্তু পরবর্তীতে তা আর পরিশোধ করে না। ব্যবসায় সফলতা না আসায় দিনে দিনে বিশাল ঋণের বোঝা আমাদের মাথায় চেপে বসে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নেই বাহরাইনে অভিবাসনের। সে সময় আমার বয়স ৩৪ বৎসর। অভিবাসনের জন্য তখন খরচ হয় ৪,৫০,০০০ টাকা। আমার স্ত্রী'র ও তার বোনের গহনা বিক্রি করে এবং এনজিও থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে বাকি টাকা যোগাড় করি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, দালাল আমার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই আমি সেই লোকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারি যে পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করেছে। টাকা পয়সা লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও দালালকে ধরার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আমার ভেতর থেকে বিদেশ যাবার নেশাটা নামছিল না। তাই আবার অন্য এক দালালের সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। সেই ব্যক্তি আমাকে বাহরাইনে একটা ঝুঁকিহীন চাকরির ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। দালাল কথা দেয় যে, তিন লাখ টাকার বিনিময়ে সে আমাকে ৪০,০০০ টাকা বেতনের চাকরি দিতে পারবে। অতীত অভিজ্ঞতার কারণে আমি তাকে মোট টাকার এক-তৃতীয়াংশ অগ্রিম দিতে রাজি হই। ভিসা পাওয়ার পর বাকি টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার করি। সে চুক্তি অনুযায়ী সময় মতো ভিসা নিয়ে আমি বাহরাইনে চলে যাই।

বাহরাইনে গিয়ে একটা নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে ৪০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে ফোরম্যান হিসেবে চাকরি পেয়ে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়ে না। চাকরিদাতা আমার পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র জব্দ করে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, এটা করা হয়েছিল আমার 'নিরাপত্তাজনিত' কারণে। আমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা কোম্পানি না করায় বেতন থেকে তা কেটে নেওয়া হতে থাকে। ফলে, আমি প্রতি মাসে মাত্র ২০,০০০ টাকা দেশে পাঠাতে পারি। আমার অভিবাসনের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় সেই তুলনায় এটা খুবই সামান্য অর্থ, যা এনজিও'র ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতেই শেষ হয়ে যায়। না পারি পরিবারকে সাহায্য করতে, না সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে। ফলে পরিবারের চাহিদা মেটাতে আমার স্ত্রী তার বাবার কাছ থেকে ঋণ করতে বাধ্য হয়। এখন বাহরাইনে আমি আরও বেশি বেতনের চাকরি খুঁজছি কিন্তু পাসপোর্ট হাতে না পাওয়ায় চাকরির আবেদনপত্র কোথাও পাঠাতে পারছি না। তাছাড়া আরও একটা ভীতির মধ্যে রয়েছি আর তা হল, বর্তমান চাকরিদাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি চাকরি ছেড়ে দিই তাহলে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করতে পারে। পুরোপুরি অনিশ্চয়তার ভেতরে দিন কাটাচ্ছি। জানিনা কী করব !

ইরাক

আমাদের ষাটজনকে তারা দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়

জুলফিকার ইসলাম

আমি জুলফিকার ইসলাম সিরাজগঞ্জ জেলার চরবানা গ্রামের বাসিন্দা। ছোটো বেলায় মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছিলাম। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের এলাকায় কোন কাজ খুঁজে পাই নাই। আমার স্ত্রী ও তিন সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল আমারই। জমিজমা তেমন ছিল না আমাদের, তাই ভেবেছিলাম বিদেশ গেলে বেশী টাকা আয় করতে পারবো। পরিবারকে সাহায্য, সন্তানদের ভালো লেখাপড়া আর অর্থ সঞ্চয় সবই হয়তো সম্ভব হবে বিদেশ গেলে। সে কারণে সিদ্ধান্ত নিই যে, অভিবাসনই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। তাই ২০১৪ সালে আমি ইরাকে চলে যাই। এটা ছিল একটা কঠিন ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমি সেখানে সতেরো মাস কাজ করার পর দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। ইরাক থেকে ফেরার পর মালয়েশিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নেই এবং সেখানে যাবার উদ্দেশ্যে দালালকে ৫০ হাজার টাকা দেই। কয়েকদিন পর দালাল আমাকে জানায়, মালয়েশিয়া নয়, সে আমাকে কাতার নিয়ে যাবে এবং সেজন্য তাকে দিতে হবে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। আমি তখন কাতার যাবার জন্য ব্র্যাক ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নেই। আরও এক লাখ বাংলাদেশী টাকা ঋণ নেই স্থানীয় সমবায় সমিতি থেকে। তারপর বাকি অর্থ যোগাড়ের জন্য জমি বিক্রি করি এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার করি। এতসব ঋণ ও জমি বিক্রির পর আমি দালালকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হই। এরপর এক সকালে দালাল আমার বাড়িতে আসে এবং জানায় ভিসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ঢাকায় যেতে হবে। অবিলম্বে আমি ডাক্তারী পরীক্ষা, আঙুলের ছাপ দেওয়া এবং সরকারি শ্রম কার্যালয়ে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি।

আমার অভিবাসনের দায়িত্ব নিয়েছিল যে দালাল সে একটি নামকরা রিক্রুটিং এজেন্সির[১] এজেন্ট হয়ে কাজ করে। সন্ধ্যা ৭ টায় আমি অফিসে গিয়ে উপস্থিত হই। আমি সেখানে প্রায় ষাট জন মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘ সময়। ওরাও আমার মত কাজের জন্য বিদেশে যেতে চায়। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ভিসা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। অবশেষে মালিক জানায় যে, কাতারের ভিসা যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ইরাকের ভিসার ব্যবস্থা হয়েছে। একথা শুনে অনেকে ইরাকে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। যাই হোক, কর্মকর্তা জানায়, আমরা যদি ইরাকে না যাই তবে আমাদের দেয়া টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। তাছাড়া সে আরও জানায়, কাতারে আমাদের বেতনের ব্যবস্থা হয়েছিল প্রতি মাসে মাত্র ২০ হাজার টাকা আর ইরাকে দেওয়া হবে ৩২ হাজার টাকা। তাদের মতে আমরা ভাগ্যবান যে আমরা ইরাক যেতে পারছি। এই অবস্থায় আর কোনো উপায় না দেখে আমি ইরাকে যেতে রাজি হই।

---

১ সঙ্গত কারণে রিক্রুটিং এজেন্সির নাম উল্লেখ করা গেল না: সম্পাদক।

অবশেষে ইরাকে পৌঁছাই এবং পৌঁছানোর পরই দালাল আমাদের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে। তারপর আমাদেরকে জোরপূর্বক গাড়িতে তোলা হয়। গাড়ির ভিতর থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম, আমাদের গাড়ি একটা কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতর প্রবেশ করছে, যেখানে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী। শেষ পর্যন্ত, নিরাপত্তা এলাকায় একটা টিন-শেড ঘরে আমাদের রাখা হয়। গাড়ি থেকে নামানোর পর আমাদের একটা রুমের ভেতরে আটকাবস্থায় রাখা হয় এবং সেখান থেকে বেরুনোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা ১৮০ জন সেই রুমের ভিতরে ছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল, ভোরবেলায় কাজের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। পরদিন, প্রত্যেকের মোবাইলের সিমকার্ড কেড়ে নেয়। এরপর প্রত্যেককে ১৫ ইউএস ডলার দিয়ে নতুন সিম কার্ড কিনে নিতে বলে। কেউ কেউ নতুন সিম কার্ড কিনে দেশে ফোন করে পরিবারকে জানায় আমরা ভাল আছি তবে কাতারে নয়, ইরাকে। এই অবস্থায় আমরা দিন কাটাতে থাকি। পরবর্তীতে তারা আমাদের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে।

এ রকম অবস্থায় এক মাস যাওয়ার পর আমরা বেতন চাই। তখন একজন কর্মকর্তা জানায়, আমাদেরকে বিক্রি করা হয়েছে। সে বলে, 'কেন তোমাদেরকে আমরা বেতন দিবো, তোমাদেরকে তো আমরা কিনে নিয়েছি। যদি আবার বেতন চাও তাহলে মেরে ফেলব'। মরুভূমিতে টিনশেডের ভেতরে বসবাস করা ছিল খুবই কষ্টকর। সেই সঙ্গে ছিল খাবার, পানি ও অন্যান্য সমস্যা। তাপমাত্রা থাকতো ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক পর্যায়ে আমাদের চর্মরোগ দেখা দেয়। এই সময় আমি একজন সশস্ত্র পাহারাদারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলি এবং তার কাছ থেকে একটা সিম কার্ড সংগ্রহ করি। পাহারাদারটি আমাকে কোরআন শরীফ ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নেয় যে একথা কাউকে জানাবো না। সিম কার্ড পাবার পর অন্য এক অভিবাসীর পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের একজন ইঞ্জিনিয়ার সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে কথা বলি। তাকে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সবকিছু জানাই। যদিও আমি তাকে চিনতাম না, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, যেহেতু তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, তিনি আমাদের ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন এবং উপকার করবেন। জনাব সিদ্দিকুর রহমান আমার পরিবারকে বিষয়টি জানায় এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা করে।

ইরাকে আসার পর থেকেই আমরা সকলে মিলে দেশে ফিরে আসার দাবি জানাতাম। আমাদের ভেতরে ষোলজন ছিল এ ব্যাপারে খুবই সোচ্চার। ফলে কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছ থেকে তাদের আলাদা করে ফেলে। কর্তৃপক্ষ বলে, তারা আমাদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেবে। এরপর তারা গাড়িতে করে আমাদেরকে অন্য এলাকায় নিয়ে আসে, লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গায়। যেখানে লোকজন একবারেই নেই। চারিদিকে কেবলই পাখিদের ওড়াউড়ি। ভেবেছিলাম আমাদেরকে মেরে ফেলবে কিন্তু তারা আমাদের আরেকটি স্থানে আটকিয়ে রাখে। তিনদিন পর এক লোক এসে বলল, আমাদেরকে কাজের জন্য বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হবে। জনাব সিদ্দিকুর তখনও আমাদের সাহায্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং বেসরকারি সংস্থা 'রাইটস্ যশোর'-এর সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই সংস্থা আমাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। শেষ

পর্যন্ত আমরা বাগদাদে পৌঁছাই এবং ৩০ হাজার টাকা মাসিক বেতনের কাজ পাই। আমি বাগদাদে ছয় মাস কাজ করেছিলাম কিন্তু কাজের শর্তগুলো ছিল খুবই কঠিন। প্রত্যেকের কাজ সিসি ক্যামেরা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হতো। কেউ একটু বিশ্রাম নিতে অল্প সময়ের জন্য কাজ বন্ধ করলেও তা ক্যামেরায় ধরা পড়তো এবং কর্তৃপক্ষের লোক এসে তাদের পেটাতো। "রাইটস্ যশোর" ও শিশুকের সহযোগিতায় আমি ছয় মাস পর দেশে ফিরে আসি। ইরাকে থাকাকালীন ৯০,০০০ টাকা দেশে পাঠাতে পেরেছিলাম। বর্তমানে আমার কোন কাজ নাই। জানিনা কীভাবে সন্তানদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করব। আমার ঋণও পরিশোধ করা হয় নাই। এখনও ৩০০,০০০ টাকা ঋণ রয়েছে। জানিনা এরপর কী করব?

দালালের কথা আর আমার অবস্থার মধ্যে ছিল স্বর্গ ও মর্ত্যের পার্থক্য

হায়দার মিয়া

আমি হায়দার মিয়া। যশোর জেলার শার্শা উপজেলার এক কৃষি পরিবারের সন্তান। কিন্তু বাবার পথ অনুসরন করার আগ্রহ কখনই ছিলনা। কিন্ত আমার এলাকায় অন্য কোনো কাজের সুযোগ না থাকায় বিদেশে চাকরি খোঁজা শুরু করি। অনেক চেষ্টার পর ২০০৮ সালে স্থানীয় এক দালালের সহায়তায় দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ইরাকের ভিসা যোগাড় করি। দালাল ইরাকের একটা হোটেলে দুই বছরের জন্য চাকরির চুক্তিপত্রের ব্যবস্থা করে। আমার বাবা আমার অভিবাসনের অর্থের জোগান দিতে গিয়ে তার ২ বিঘা জমি ইজারা দেন।

কথা ছিল ইরাকে পৌছানোর পর বিমান বন্দরে কেউ আমাকে নিতে আসবে। কিন্তু বিমান বন্দরে দুইদিন কাটানোর পরও যখন কেউ আসলো না, তখন আমি সেখানকার পুলিশকে বিষয়টা জানাই। আমার রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে পুলিশ যোগাযোগ করে। তারপর এজেন্সির একজন প্রতিনিধি আমাকে বিমানবন্দর থেকে মাজহাব শহরে নিয়ে যায়। সেখানে যেয়েই কাজ শুরু করি। তবে আমাকে নির্দিষ্ট কোনো কাজ দেয়া হলো না। তারা যে কাজের কথা বলত তাই করতে হতো।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার আগে দালাল আমাকে ৩৫০ ইউএস ডলার বেতন দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল কিন্তু আমাকে দেওয়া হতো মাত্র ২০০ ইউএস ডলার। অনেক অনুরোধ করার পর আমার চাকুরিদাতা বেতন মাত্র ২৫ ডলার বাড়িয়ে দেয়, যা প্রতিশ্রুত বেতনের চেয়ে কম ছিল। এখানে আমাকে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হতো এবং কোন ওভারটাইম দেওয়া হতো না। কখনও কখনও ১২ থেকে ১৬ ঘন্টাও কাজ করেছি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আমাকে দেওয়া হতো না। এ অবস্থায় দুই বছর কাটে এবং দুই বছর পর অবশেষে দেশে ফিরে আসি। বর্তমানে লেবাননে অভিবাসনের চেষ্টা করছি। আমি শুনেছি ইরাকের চেয়ে লেবাননের অবস্থা অনেক ভালো।

কখন পাওনাদার আসে, এই ভীতির মধ্যে দিন কাটাই

নাসির আলম

আমি নাসির আলম। আমার বয়স ৪৭ বছর। নোয়াখালী জেলার চাঁদপুরের বাসিন্দা। বিদেশে যাওয়ার আগে আমি নির্মাণশিল্পে কাজ করতাম। প্রতি মাসে বেতন পেতাম ১০ হাজার টাকা। পরিবারে প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট ছিল না। সে সময় আমার তিন সন্তান লেখাপড়া করছে। পরিবারে তখন বিভিন্ন রকমের চাহিদা ছিল। সংসারে সচ্ছলতা ছিলনা কখনোই। সুতরাং আমি নিজে অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেই। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে এক প্রতিষ্টিত রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করি।

আমার যাওয়ার কথা ছিল কাতারে কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আমাকে ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে ইরাকে পাঠিয়ে। আমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নিয়মিত বেতনসহ একটা ভালো চাকরির। ফলে অভিবাসনের পুরো টাকাটাই আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ঋণ করেছিলাম। ইরাকে আমি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। সেখানে আমি কোনো কাজ পাই নি। প্রচণ্ড গরমের ভেতরে আমাকে মরুভূমিতে রাখা হয়েছিল। প্রায়ই আমি অনাহারে থাকতাম। ঘনঘন আমাকে শারীরিক অত্যাচার করা হতো। পাঁচ মাস পর রিক্রুটিং এজেন্সির প্রধান ইরাকে আমাদেরকে দেখতে আসে এবং নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে। দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বললে আমাদেরকে নির্মমভাবে পেটানো হয়। আমাদের মোবাইল ফোনগুলো কেড়ে নেওয়া হয় যেন পরিবারকে কোনো কিছু জানাতে না পারি। শেষ পর্যন্ত তিন মাস পর একটা মোবাইল ফোন যোগাড় করে বেসরকারি সংস্থা 'রাইটস যশোর' এবং আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাদেরকে আমার অবস্থাটা জানাই এবং তারা আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। বর্তমানে দেশে আমার কোনো কাজ নাই। যথেষ্ট লেখাপড়াও জানিনা যে কোনো অফিসে কাজ করব। এমন কী সেরকম টাকাও নেই যে কোনো ব্যবসা করব। এখনও বহু লোকের কাছে ঋণ রয়েছে। সে কারণে বাড়িতে থাকতে পারি না। কখন পাওনাদার আসে এই ভীতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তাদের ঋণ শোধ করার মতো কোনো টাকা আমার নাই।

কুয়েত

আমার ভেতরে এক নতুন আমি তৈরী হয়েছে

জামিলা বেগম

আমি জামিলা বেগম। অল্প বয়সে বাবাকে হারাই। বিয়েও হয় খুব অল্প বয়সে কিন্তু কয়েক বছর পর স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করে এবং মায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আমার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট স্বচ্ছল অবস্থা আমার মায়ের ছিল না। সে জন্য মাটি কাটার সরকারি কর্মসূচিতে দিন মজুর হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। এ সময় আমার কয়েকবার কয়েকজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক হয় এবং মনে মনে চাইতাম এই সম্পর্কের পরিণতি যেন হয় বিয়ে। কিন্তু এইসব পুরুষ অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহী হলেও বিয়ে করার কথা বললেই আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। দিনে দিনে আমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে আমি দেশত্যাগ করি। কাজ করতে কুয়েতে চলে যাই। প্রাথমিক অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার কাজটা ছিল খুবই কঠিন, কিন্তু যে পরিবারের সাথে আমি ছিলাম তারা ছিল দয়ালু এবং ধার্মিক। সেই বাড়িতে আরও দুইজন গৃহকর্মী ছিল-একজন বাবুর্চি, অন্যজন ঘরবাড়ি পরিষ্কার করতো। আমার দায়িত্ব ছিল বৃদ্ধ পরিবার প্রধানের পরিচর্যা করা। তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না। প্রথম প্রথম আমি জানতাম না কিভাবে এরকম একজন লোকের যত্ন নিতে হয়। ক্রমশ সেই বাড়ির এক পূত্রবধূ আমাকে শিখিয়ে দেয়, কিভাবে তাকে গোসল করাতে হবে, কিভাবে যত্ন নিতে হবে। অনেক দিন বিছানাগত থাকায় সৃষ্টি হওয়া পিঠের ক্ষত কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং কোন কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে-এসব কাজও আমি তার কাছেই শিখেছি। তার কাছে আমি ডায়াবেটিস রোগীকে কীভাবে ইনসুলিন দিতে হয় তাও শিখেছিলাম। আমি বারো বছর কুয়েতে ছিলাম এবং এই পুরোটা সময় কাজ করেছিলাম একটা বাড়িতেই। তারা আমাকে পরিবারের সদস্য বলে মনে করত। আমি বাড়ির মেয়েদের বিভিন্ন পার্টিতে অংশগ্রহণ করতাম। এই বার বছরের ভেতরে আমি দুই বার দেশে এসেছি এবং আমার গ্রামের দুইজন মেয়েকে অভিবাসনে সাহায্য করেছি। আমি আমার পরিবারে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছি, যা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতো। কুয়েত থেকে ফিরে আসার সময় আমার সঞ্চয় ছিল ৮০০,০০০ টাকা। সেই টাকা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় বাজার এলাকায় একটা দর্জির দোকান খুলেছি। সেখানে চাকরি দিয়েছি দুইজন লোককে-একজন দর্জি, একজন তার সাহায্যকারী। পুনরায় অভিবাসন করার কোন ইচ্ছা আমার নাই।

মাথায় ঋণের বোঝা, তবুও আবার যেতে চাই

মোহাম্মদ নিয়াজ উদ্দিন

আমি মোঃ নিয়াজ উদ্দিন। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমি বিদেশ থেকে ফেরত আসা একজন অভিবাসী। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন। বাবা, মা, এক ভাই, এক বোন ও আমি। আমাদের সামান্য কৃষিজমি ছিল কিন্তু এই জমিতে উৎপন্ন ফসলে পরিবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না। বাবার সঙ্গে আমি কৃষিজমিতে চাষাবাদের কাজ করতাম এবং গ্রামে একটা মুদির দোকান চালাতাম। বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুদির দোকান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। অতএব, আমাদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল কৃষিজমি যা দিয়ে সংসার চলতো না। সে কারণে, ২০১২ সালে ২৮ বছর বয়সে ২,০০,০০০ টাকা খরচ করে কুয়েতে অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেই। পুরো টাকাই দালালের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এর বাইরে আরও ৫০,০০০ টাকা খরচ হয় ডাক্তারী পরীক্ষা, যাতায়াত খরচ, পোশাক, জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি কিনতে। এই টাকার কিছুটা দিয়েছিল আমার বাবা। বাকিটা ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলাম। দালাল আমাকে ২০,০০০ টাকা মাসিক বেতনে একটা মুরগির খামারে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কুয়েতে আসার পর ছয় মাস আমি বেকার ছিলাম। এই ছয় মাস দেশ থেকে আনা টাকা দিয়ে থাকা ও খাওয়ার খরচ চালাতাম। তখন বিভিন্ন বাড়িতে এবং একটা শপিংমলে ক্লিনারের কাজ করেছি। এ সময় যে দালাল আমাকে কুয়েতে পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। অবশেষে, ৭ হাজার টাকা মাসিক বেতনে একটা সবজি বাগানে চাকরি পাই। আমার নিজের খরচ চালিয়ে বাড়িতে পাঠানোর মত কোনো টাকা থাকতো না। সত্যি বলতে কি, ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত টানা তিন বৎসর কাজ করেও কোন অর্থ সঞ্চয় করতে পারিনি, পারিনি দেশে কোন টাকা পাঠাতে। এমনকি ব্যাংকের ঋণও পরিশোধ করতে পারিনি। আমার বাবা তার গরু ও ছাগল বিক্রি করে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে সাহায্য করেছেন এবং বর্তমানে আমাদের আয়ের আর কোন উৎস নেই। বাংলাদেশে ফিরে এখনও আমি কোন কাজ পাইনি। দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। যদিও বাবাকে চাষাবাদে সাহায্য করছি কিন্তু তা আমাদের পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমি আবার বিদেশ যেতে চাই।

আমি স্বপ্ন দেখি আমার এলাকায় একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার

মোহাম্মদ মইনুল হোসেন

আমি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার কোলাইল গ্রামের বাসিন্দা। আমার দুই ভাই ১৯৮০ এর দশকে বিদেশে যায় এবং আমিও তাদের পথ অনুসরণ করে কুয়েতে যাই। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। আমার বড় দুই ভাই কুয়েতে ড্রাইভারের কাজ করত। সুতরাং বিদেশে যাবার আগে আমি ড্রাইভিং শিখে নিই, তবে তা দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যে নয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভাইদের সঙ্গে যোগ দেওয়া। কুয়েতে আমি নয় বছর ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেছি। আমার ভাইয়েরাও একই সময়ে সেখানে কাজ করেছে। বর্তমানে আমার

এক ভাই দেশে ফেরত এসেছে এবং টঙ্গিতে ব্যবসা শুরু করেছে। আমি কুয়েত থেকে ফেরত আসার পর একটা রাইস মিল প্রতিষ্ঠা করেছি। ব্যবসা মোটামুটি সফলভাবেই চলছে। সম্প্রতি দুটো পিক-আপ ভ্যান কিনেছি এবং আরও কিনেছি দুটো পাকা দোকান। জমিও কিনেছি চার গন্ডা। এসব থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রতি মাসে আয় করছি এবং বার জন লোক সেখানে কাজ করে। আমি আমার গ্রামে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি যেখানে আমার এলাকার মানুষ উন্নতমানের চিকিৎসা পেতে পারে।

অভিবাসন আমাকে একের পর এক ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে

মানিক মিয়া

আমি কুমিল্লা জেলার পরমতলা গ্রামের বাসিন্দা। এই গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। আমাদের পারিবারিক জীবনও চলতো খুব কষ্টে। এই গরিবীই আমাকে দায়িত্ববান হতে শিখিয়েছে। সিদ্ধান্ত নেই যে, দরিদ্র অবস্থা দূর করতে বিদেশে গিয়ে কাজের সন্ধান করার। কিন্তু অভিবাসনের জন্য যথেষ্ট অর্থ আমার ছিল না। নিকট ও দূরের আত্নীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করে ১৯৯৩ সালে কুয়েতে যাই। অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কুয়েতে কাজ শুরু করি। এক বছরের ভেতরেই দেশে টাকা পাঠাতে থাকি, যা থেকে আমার পরিবার ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করে। পাঁচ বছর কুয়েত থাকার পর বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং চাষাবাদের জন্য কিছু জমি ক্রয় করি। এভাবেই আমার উন্নতির শুরু। আবার কুয়েতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। দ্বিতীয়বার কুয়েতে গিয়ে নয় বছর কাজ করার পর বাংলাদেশে ফিরে আসি।

দেশে ফিরে কীভাবে টাকা বিনিয়োগ করবো বুঝতে পারছিলাম না। সে সময় আমার বন্ধু আনিস মিয়া ও তাজুল ইসলাম পরামর্শ দেয় নিজের জমির পুকুর ও আরও কিছু পুকুর লিজ নিয়ে সেখানে মাছ চাষ করতে। তারা ভেবেছিল এটা আমার জন্য ব্যবসা হিসেবে লাভজনক হবে। তাদের পরামর্শে আমি মাছ চাষ করতে শুরু করি। প্রথম বছরে অনেক টাকা লাভ হয়। এতে আমি উৎসাহ বেড়ে যায় এবং গ্রামের আরেক পাশে আরও চারটি পুকুর লিজ নেই। জালসহ মাছ ধরার ও মাছ চাষের যাবতীয় উপকরণ তৈরি করে নেই। এসব পুকুরে কাজ করার জন্য সাতজন লোক নিয়োগ করেছি। মাছ ধরার সময় হলে আরও শ্রমিক নিয়োগ করে থাকি।

এক পর্যায়ে আমার মনে হলো পুকুরে মাছের জন্য আমি যে খাবার বাইরে থেকে কিনি, তা তো নিজেই উৎপাদন করতে পারি। তাতে মাছের খাবার বিক্রি করে যেমন আয় বাড়বে তেমনি আমার নিজের মাছ চাষের খরচ কমে যাবে। মাছের খাবার তৈরির মেশিনপত্র কেনা হয়েছে। আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই সেগুলো বসিয়ে উৎপাদন শুরু করতে পারবো। আমার অভিবাসন-অভিজ্ঞতা আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে। নিজেকে এখন ভাগ্যবান মনে হয়। কারণ সংসারের সকল চাহিদা মেটাতে আমি এখন সক্ষম।

ঋণী থেকে ধনী

মোহাম্মদ আশিক মিয়া

আমি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার টেরিয়াইল গ্রামের বাসিন্দা। জীবনের শুরুতেই বহু কষ্টকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। আমার না ছিল চাকরি, না ছিল ব্যবসা করার মতো অর্থ। এরকম অর্থনৈতিক অবস্থায় আমি কোন আশার আলো দেখতে পেতাম না। তাছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতাও ছিল কম। ফলে সমাজে মাথা উচু করে কথা বলতে পারতাম না। বর্তমানে আমার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যা দেশে করতে পারিনি তা করেছি প্রবাসে। তবে তা অর্জন করতে আমাকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে। দীর্ঘদিন আপনজনদের থেকে দূরে থাকা যে কী বেদনাদায়ক তা কেউ বুঝবে না যদি সেই অভিজ্ঞতা কারো না থাকে।

আমাদের পরিবার থেকে আমার বড় ভাই আবু বকর প্রথম অভিবাসী হয়। সে ১৮ বছর কুয়েতে কাজ করেছে। আমি তার সহযোগিতায় কুয়েতে যাই এবং পাঁচ বছর সেখানে কাজ করি। আমার অভিবাসন বাবদ খরচ হয়েছিল ৯০,০০০ টাকা। কুয়েতে একই কোম্পানিতে একটানা পাঁচ বছর কাজ করেছিলাম এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। এই সঞ্চয়ই আমার জীবন বদলে দেয়। এখন সমাজে আমি মাথা উচু করে কথা বলতে পারি। দেশে ফেরত আসার পর বড় ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিই যে আমি আর বিদেশে যাব না কারণ আর্থিকভাবে আমি আর এখন অসহায় নই। বরং দেশেই ভালো কিছু একটা করার কথা ভাবতে থাকি। কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের পরিবার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হয় এবং আমরা একটা ব্যবসা শুরু করি। এই ব্যবসার মূলধনের জোগান দেই আমি এবং আমার ভাই। আগে আমরা সব সময়ই ঋণগ্রস্থ থাকতাম কিন্তু বর্তমানে আমরা ধনী হয়েছি। এখন অন্যকে ঋণ দেয়ার সামর্থ্য রাখি।

বাংলাদেশে ব্যবসা করার সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে, আমি কিছু জমি ক্রয় করি এবং মাছ চাষের পাশাপাশি স্থাপন করি একটা মুরগির খামার। মাছ চাষ সম্প্রসারণের জন্য নিজের পুকুর ছাড়াও আরও একটা পুকুর লিজ নিয়েছি। মাছ চাষ থেকে বছরে আমার খরচ বাদ দিয়ে গড়ে ২,৫০,০০০ টাকা আয় হচ্ছে আর মুরগির খামার থেকে আয় হচ্ছে গড়ে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া স্যানিটেশন সামগ্রী তৈরির একটা কারখানাও প্রতিষ্ঠা করেছি। পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করে স্থানীয় বাজারে একটা ছোটখাটো শপিংমল বানিয়েছি। বর্তমানে সেখান থেকে বছরে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ভাড়া পাই। বর্তমানে আমার সম্পদের পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকার মতো। প্রায় ৪০ জন মানুষের কর্মসংস্থান করতে পেরেছি। বিদেশে আয় করা টাকা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি বলেই আজ আমি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি।

পরিশ্রম এবং সঞ্চয়ই দিয়েছে আমার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য

মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন

বাংলাদেশে একটা চাকরি খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। অন্তত আমি পাইনি। তাই বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সবসময় আমি স্বপ্ন দেখতাম একটা চাকরির যা পরিবারে সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে। আমার বাবা খুব একটা ধনী ছিলেন না। তার একটা ছোটোখাটো ব্যবসা ছিল এবং আমাদের পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র উর্পাজনক্ষম ব্যক্তি।

আমি ১৯৯৭ সালে একটা রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করি বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার আশায়। সেই এজেন্সি আমাকে কুয়েতে একটা চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। ফলশ্রুতিতে আমি কুয়েতে পোষ্টম্যান হিসেবে কাজ শুরু করি। বেতন ছিল মাসিক ৬০০ কুয়েতী দিনার যা প্রায় ২,০০০ ইউএস ডলার সমমানের। কুয়েতে বসবাসকালে আমি খুবই মিতব্যয়ী জীবনযাপন করেছি। ফলে আয়ের বেশির ভাগ অর্থই সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম এই অর্থ বিপদের দিনে অথবা ভবিষ্যত আয়ে সাহায্য করবে। বিদেশে থাকা অবস্থায় বাস্তব জীবন সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম যা আমাকে জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে সাহায্য করেছে। আইন-কানুন সম্পর্কে বহু কিছু শিখেছিলাম। একই সাথে শিখেছিলাম অফিসের কাজ ও অন্যান্য পেশাগত বিষয়।

আমি ২০১১ সালে বাংলাদেশে ফেরত আসার আগে ১৩ বছর কুয়েতে কাজ করেছি। সম্প্রতি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছি যা ভালোই চলছে। নির্মাণ করেছি একটা নতুন বাড়ি এবং ক্রয় করেছি কিছু জমি। সরকার বা অন্য কারো সহযোগিতা কখনো পাইনি। যদিও পরিবার-পরিজন ছেড়ে দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলাম, তারপরও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আমি অর্জন করেছি। যদি কেউ কষ্ট করে সাফল্য অর্জন করে তবে সেই জানে কষ্ট সহ্য করার জন্য কতটা মনোবল থাকতে হয়! আমি চাই সকলেই তাদের কষ্ট করে অর্জন করা সম্পদের সঠিক ব্যবহার করুক। দুঃখ একটাই, সরকার আমাদের দিকে তাকায় না।

ওমান

ওমানে না গেলে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাতাম না

সুরেশ নাথ

বর্তমানে আমার বয়স সত্তর। অভিবাসী হওয়ার আগে কাজ করতাম মাধবকুন্ডের একটা পাটের কলে। পাশাপাশি নিজের জমিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপন্ন করতাম। কিন্তু এভাবে পরিবারের চাহিদা মেটানো ছিল খুবই কঠিন। সে কারণে পেশা বদলানোর চিন্তা করি। মোটকথা আমি আমার জীবন বদলাতে চেয়েছিলাম।

বিশ বছর পাটের কলে কাজ করার পর আমি মাত্র ৮০ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম যার পুরোটাই অভিবাসনে ব্যয় হয়ে যায়। বারো বছর ওমানে কাজ করেছি। তখনই আমার বড় ছেলেকে সেখানে নিয়ে যাই। আমরা যৌথভাবে জীবনটা বদলানোর চেষ্টা করি। তারপর আমার বড় ছেলে তার ছোট দুই ভাইকেও ওমানে নিয়ে যায় একসাথে কাজ করার জন্য। বর্তমানে আমার তিন ছেলেই বিদেশে কাজ করছে। পাশাপাশি ছোটখাটো ব্যবসাও করছে। ছেলেরা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়। ছেলেদের পাঠানো টাকা দিয়ে আমি বাড়ির পাশে, সীতাকুন্ড কলেজ রোডে, একটা ছোট দোকান দিয়েছি। কলেজ রোডের কাছাকাছি আলাদা আলাদা পাঁচ খন্ড জমি কিনেছি, যার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকার মতো। কেনা জমির উপরে ইতিমধ্যেই দুটি বাড়ি বানিয়েছি। এই বাড়ি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভাড়া আসে এবং তার একটা বড় অংশ ব্যাংকে সঞ্চয় করি। আমি মনে করি এসবই পরিবারের সম্মিলিত উর্পাজন। আমার ছেলেরা টাকা পাঠায় তার মায়ের নামে এবং তার মায়ের নামেও কিছু সম্পত্তি রয়েছে।

আমি যদি ওমানে না যেতাম তবে কখনও বর্তমান অবস্থায় পৌঁছাতে পারতাম না। অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম এবং আমার ছেলেরাও তাই করছে। আমার ছেলের বৌ-ঝিদের শাড়ী কাপড়ের ঝোঁক নাই। সাজন গোজনও কম। কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পেরেছি। তাই আমাদের পরিশ্রমের অর্থের কোন অপচয় হয় নাই। পরিশ্রমের সেইসব বছরগুলোর সুফল এখন উপভোগ করছি। বিদেশে আয় করা টাকা সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত ছিল আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশ থাকাকালীন যদি অমিতব্যয়ী জীবনযাপন করে অর্থ অপচয় করতাম তাহলে আজ যা যা অর্জন করেছি তার কিছুই সম্ভব হত না। আমি মনে করি সকল অভিবাসীর অর্থ সেসব খাতে খরচ করা উচিত যেসব খাতে দীর্ঘমেয়াদী লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

জিরো থেকে হিরো

ফরিদুর রহমান

আমি রিক্তপ্রায় একটি পরিবারের সদস্য। কিন্তু পরবর্তীতে কাজের উদ্দেশ্যে ওমান যাবার ফলে আমার পরিবারের ভাগ্যে পরিবর্তিন এসেছে। অন্যান্য অনেকের মতো আমি মাত্র আঠারো বছর

বয়সে বিদেশে যাই। আমার পরিবার এতটাই গরিব ছিল যে, কোন মতে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হতো। আমার অভিবাসনের খরচ যোগাড় করতে হয়েছিল ঋণ করে।

ওমানে গিয়ে প্রথম অবস্থায় আমি বিদ্যুৎ মিস্ত্রির সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ পাই। শিক্ষানবিশ হিসেবে তাকে সাহায্য করতে করতে কাজটা আমি শিখে ফেলি। পরের বছর আমি আমার কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে একদল বিদ্যুৎকর্মীর সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ শুরু করি। এ সময়ে আমি ওমানে আর্থিকভাবে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হই। বলতে গেলে স্বচ্ছল হয়ে উঠি। প্রথম প্রথম সঞ্চিত অর্থ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে পাঠাতাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি হুন্ডি ও ব্যাংক দুই মাধ্যমেই টাকা পাঠাতাম। নির্ভর করত টাকার পরিমাণের ওপর।

আমি ওমানে বাইশ বছর কাজ করেছিলাম। আমার পাঠানো অর্থ দিয়ে পরিবারের লোকেরা ১৬ ডেসিমেল জমি কিনেছে। বর্তমানে এই জমির মূল্য প্রায় ২০-২৫ লাখ টাকা। আগে আমাদের টিনের ঘর ছিল। এক লাখ টাকা খরচ করে সেখানে পাকা ঘর নির্মাণ করেছি। দেশে ফিরে আসার পর স্থানীয় বাজারে চার লাখ টাকা খরচ করে একটা দোকান করেছি। সেখান থেকে মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা আয় হয়। এছাড়া আমি দুজন গ্রামবাসীকে ওমানে যেতে সাহায্য করেছি। তারা এখন সেখানে কাজ করছে এবং তাদের পরিবারকে সাহায্য করছে। আমি আমার ভাগ্য গড়ে নিয়েছি। আমার ভালো লাগে পথ চলার সময় যখন অনেকে আমার দিকে সম্মানের চোখে তাকায়। পাঁচটা গ্রাম্য শালিসে আমাকে ডাকে। এসব ফেলে এখন আর বিদেশে যেতে চাই না। সত্যি কথা বলতে কি আমার জীবন হচ্ছে জিরো থেকে হিরো হওয়ার আসল উদাহরণ।

আশা করি আর পেছনে তাকাতে হবে না

মোহাম্মদ আহসান

আমি চট্টগ্রাম জেলার চাঁপাতলী গ্রামের বাসিন্দা। মনে পড়ে কয়েক বছর আগেও আমি আমার প্রতিবেশীদের সমৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে থাকতাম, যাদের পরিবারের সদস্যরা বিদেশে কাজ করত। তাদের দেখাদেখি আমিও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একদিন আমিও বিদেশে যাবো কাজ করতে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও কোনভাবে বিদেশ যেতে পারছিলাম না। অবশেষে, কিছুদিন পর আমার স্বপ্ন সত্যি হল। কাজের জন্য ওমানে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পেলাম।

কিছু টাকা দিয়ে প্রক্রিয়া শুরু করি। ভিসা পাওয়ার পর অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির স্থানীয় সদস্যকে দিয়ে তা পরীক্ষা করাই। তারা জানায়, ভিসাতে কোন সমস্যা নাই। আমি তখন অভিবাসন খরচের বাকি টাকা পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নেই। সে সময় আমি একটা প্রমাণপত্র তৈরী করেছিলাম যেখানে ভিসার অর্থ প্রদান ও শর্তাবলী লেখা ছিল। তিনজন সাক্ষী অফিসিয়াল স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করেছিলো। সবশেষে আমি আমার ভিসার টাকা পাঠিয়েছিলাম ব্যাংকের মাধ্যমে যাতে তার প্রমাণ থাকে এবং চাইলে পরবর্তীতে যাচাই করা যায়। এসব কিছু করার পর আমি দেখতে পাই আমার আরও এক লাখ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমার কাছে আর কোনো টাকা ছিল না। ফলে আমি বসতবাড়ি বিক্রির কথা চিন্তা করি।

এ সময়ে স্থানীয় "অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি"র এক জন সদস্য আমাকে 'সংশপ্তক' নামে স্থানীয় একটি এনজিও-তে নিয়ে যায়। তাদের পরামর্শ অনুয়ায়ী আমি ব্র্যাক ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নেই। এভাবে শেষ পর্যন্ত আমি ওমানে যেতে সক্ষম হই এবং সেখানে গিয়ে একটা চাকরিতে যোগ দেই। যার স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম বহু বছর ধরে। মোটকথা বড় ধরনের কোনো সমস্যা ছাড়াই আমি আমার অভিবাসী জীবন কাটাচ্ছি। আশা করি আর আমাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না।

অভিবাসন আমাকে কিছুই দেয়নি, বেদনা আর বেকারত্ব ছাড়া

হাশেম রহমান

আমি হাশেম রহমান কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বাসিন্দা। আমি একজন ফেরত আসা অভিবাসী। ২০১৫ সালে ২৩ বছর বয়সে আমি বিদেশ গিয়েছিলাম। বিদেশে যাবার আগে আমি কুমিল্লা কমার্স কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। পাশাপাশি কাজ করতাম গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য। ছয় সদস্যের পরিবার ছিল আমাদের: বাবা, মা, এক ভাই, আমি এবং দুই বোন। তখন সবার জন্য তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা করাই ছিল একটা কঠিন কাজ। সুতরাং কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় আমি অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেই। দালালকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার পর সে জানায় ওমানে রেষ্টুরেন্টে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। ওমানে পৌঁছানোর পর অন্য এক দালাল আমাকে ও অন্যান্য অভিবাসীদের একটা ডরমিটরিতে নিয়ে যায়। আমরা সেখানে তিন দিন ছিলাম। এক রাত্রে মালিক এসে প্রত্যেকের পাসপোর্ট জব্দ করে। সে আমাদেরকে একটা সরকারি অফিসে নিয়ে যায় কাগজপত্র যাচাই করার জন্য। তারও একদিন পর মালিক আমাদেরকে কাজের জায়গায় নিয়ে যায়।

আমি জানতাম যে রেষ্টুরেন্টে কাজ করবো কিন্তু মালিক জানায় যে কিচেন তৈরির কাজ এখনও শেষ হয় নাই। তাই যতদিন কিচেন তৈরি না হচ্ছে ততদিন কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে হবে। আমি তার কথা মতো কাজ করতে থাকি। কর্মক্ষেত্রে কিছু বাংলাদেশী সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয় এবং তারা বলে যে আমি এখানে নিয়মিত বেতন পাব না। এক বছর ও তার বেশি সময় ধরে অনেকে এখানে কাজ করছে কিন্তু বেতন পেয়েছে সাত মাসের। আর যারা ছয় মাস ধরে কাজ করছে, তারা পেয়েছে তিন মাসের বেতন। আমার মতো অনেককেই রেস্টুরেন্টে কাজের কথা বলে আনা হলেও তাদের দিয়ে জোর করে কনস্ট্রাকশনের কাজ করানো হয়েছে। এ অবস্থায় আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়ি।

এক মাস কাজ করার পর বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করলে মালিক জানায় পরে দেওয়া হবে। কনস্ট্রাকশনের কাজ কমে এলে আমাকে সবজি বাগানে কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়। এখানে একদিন আমাকে গাছে উঠে ডাল কাটতে বলা হয়। কিন্তু গাছে চড়ার সময় আমি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডে আঘাত পাই এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হতে থাকে। তিন মাস আমি হাসপাতালে ছিলাম। আমার মেরুদণ্ডে অস্ত্রপচার করা হয় এবং তিন মাস হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতে বাধ্য হই। খানিকটা সুস্থ হলে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে আমি দেশে

ফেরত আসি। আমি এখন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজের সন্ধান করছি। যদি পেয়ে যাই তাহলে দেশেই থাকব। আর কখনই বিদেশ যাব না। ওমানে দুই মাসের কাজের কোনো টাকা আর পাইনি। অভিবাসন আমাকে কিছুই দেয় নাই, বেদনা এবং বেকারত্ব ছাড়া।

কোথাও শান্তি পাইনি- না দেশে, না ওমানে

রাশেদা

আমি রাশেদা। একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। আমার বাড়ি গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে। বয়স চৌত্রিশ। মাত্র আঠারো বছর বয়সে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। তখন জানতাম না যে স্বামীর আরেকটা বউ ও সন্তান আছে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে আমার একটা মেয়ে হয়। মেয়ে হওয়ার খবর শুনেই আমার স্বামী রেগে যায়। প্রায়ই আমার স্বামী মেয়েকে মারধোর করতো। কোনো উপায় না দেখে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে আসি। সেখানে আমার চার বোন ও তিন ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করতে থাকি। আমার বাবা একজন গরিব দিনমজুর। তার একার পক্ষে আমাদের সবার ভরণপোষণ চালানো প্রায় অসম্ভব ছিল। আমি এবং আমার মেয়ে তখন তার উপর একটা বাড়তি বোঝা ছাড়া আর কিছু না। এ রকম অবস্থায় আমি বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। প্রতিবেশী একজন মহিলা দালাল আমাকে ওমান যেতে সাহায্য করে। এজন্য তাকে ৯০ হাজার টাকা দিতে হয়। তখন আমার বয়স ছিল ৩১ বছর।

ওমানে পৌঁছানোর পর আরেক দালাল ৫০ হাজার টাকা দিলে ভালো চাকরি যোগাড় করে দিবে বলে জানায়। আমার কাছে সেই টাকা ছিল না। তাই ভালো চাকরি যোগাড় করতে পারি নাই। তারপর একটা বাড়িতে মাসিক ৬০ ওমানি রিয়াল বেতনে গৃহকর্মীর কাজ জুটিয়ে নেই। সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা আট জন। পরিবারপ্রধান শারীরিকভাবে পঙ্গু। আমি নিয়মিত বেতন পেতাম কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। পঙ্গু মালিকের যাবতীয় সেবার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ফুট-ফরমাসও খাটতে হতো। এত কাজ করার পর আমার বিশ্রামের সময় ছিল খুবই অল্প। এভাবে কয়েক মাস চলার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আগের মতো কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে যায়। আমার চাকরিদাতার কোনো বিবেচনাবোধ ছিল না। সে চাইত আগের মতোই সব কাজই করি। আমার শারীরিক অবস্থার বিষয়টা সে আমলেই নিতো না। সত্যি বলতে, আমি আর আগের মতো কাজ করতে পারতাম না। নিরুপায় হয়ে এক বছর নয় মাস পর আমি দেশে ফিরে আসি। মেয়েকে দেখার জন্যও মনটা দেশে পড়ে থাকতো। আমি আর বিদেশ যেতে চাই না। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে একটা কাজের সন্ধান করতে চাই।

অভিবাসন আমাকে গড়েছে আবার অভিবাসনই আমাকে ভেঙেছে

ইমরান আলী

আমার নাম ইমরান আলী। চট্টগ্রাম জেলার পীরখাইন গ্রামে আমার বসবাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স প্রায় দশ বছর। শিশু হিসেবে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতাম। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বুলেট, গ্রেনেড ও অন্যান্য জিনিস পৌঁছে দিয়ে তাদের সাহায্য করতাম। যুদ্ধ শেষে আমি গ্রামে ফিরে আসি। সেখানে কয়েক বছর বসবাস করেছি এবং শ্রম দিয়েছি কৃষি জমিতে। ১৯৭৬ সালে ওমানে চলে যাই অধিকতর আয়ের সন্ধানে। প্রকৃতঅর্থে, সে সময় আমার কাছে কোন অর্থ ছিলনা। পরিচিত এক স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা ঋণ নেই। আমি আট বছর ওমানে কাজ করেছিলাম। সে সময় পরিবারে অনেক অর্থ পাঠিয়েছি। বাবা যখন মারা যায় তখন আমি খুব ছোটো ছিলাম। বড় ছেলে হওয়ায় আমার ভাইবোনদের ভরণপোষণ, লেখাপড়া এবং বিয়ের যাবতীয় খরচ আমাকেই বহন করতে হয়েছিল।

দেশে ফিরে আসার পরও পরিবারের সকলকে সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখি। এ সময় কিছু কৃষিজমি কিনে চাষাবাদ শুরু করি। এর কিছুদিন পর আমি সানোয়ারা বেগমকে বিয়ে করি। তখন আমার বয়স ২৮ বছর। এখন আমার তিনটি কন্যাসন্তান। বিয়ের দুই বছর পর আবার বিদেশ যাই কাজ করার জন্য। এবার যাই দুবাই। সেখানে অনেকগুলো প্রকল্পে ও বিভিন্ন শহরে আমি নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে থাকি। এ কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কোম্পানির চিফ ফোরম্যান এর পদ লাভ করি। কাজে জ্ঞান ও দক্ষতার কারণে কোম্পানির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় এবং আমি আর্থিকভাবে লাভবান হই। আমার তত্ত্বাবধানে কর্মচারিদের দেখাশোনার বিষয়টিও নিশ্চিত করি। একই সঙ্গে তাদের কল্যাণের দিকেও নজর রাখতাম। কর্মীদের প্রয়োজনীয় পোশাক, নিরাপত্তা-যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জোগান নিশ্চিত করার কারণে আমার কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পায়।

পরিবারকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতে থাকি। আমি ১৯৯৫ সালে কাজ থেকে চার মাসের অবসর পাই এবং বাংলাদেশে আসি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। তখন সঙ্গে আনা কম্বল ও রেডিওর মতো ছোটখাটো উপহার পরিবারের লোকেরা বেশ উপভোগ করে। আমাদের দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয়েছিল ১৯৯৬ সালে এবং তখন আবার আমি বাংলাদেশে এসেছিলাম। এ সময় ব্যাংকে আমার কিছু সঞ্চয় ছিল। ১৯৯৯ সালে দুবাইতে আমার পুরানো কর্মস্থলে ফিরে যাবার আগে দুই বছর বাংলাদেশে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করেছিলাম। এই তৃতীয় অভিবাসনের জন্য খরচ হয়েছিল মাত্র ৩০ হাজার টাকা। কারণ খরচের বেশির ভাগই বহন করেছিল আমার চাকরিদাতা।

আট বছর কেটে যাওয়ার পর নির্মাণশিল্পে আমি খণ্ডকালীন কাজ করতে শুরু করেছিলাম। বাকি সময় কাটাতাম ভিসা যোগাড় করা এবং তা বিক্রির কাজে। এসব ভিসা আমি বিক্রি করতাম আমার গ্রামের সেইসব মানুষের কাছে যারা কাজের জন্য বিদেশ আসতে চায়। এই প্রক্রিয়ায়

আমি বহু বাংলাদেশীকে দুবাই-এর নির্মাণশিল্পে কাজ জোগাড় করে দিয়েছি। এই ব্যবসাটা আমি পরিচালনা করেছিলাম আমার চাকরিদাতার সহযোগিতায় এবং এটা ছিল একটা সফল ব্যবসা। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পর দুবাই-এর কনস্ট্রাকশন খাত পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং আমার ব্যবসাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। আমার অনেক টাকা খাটানো ছিল এই ভিসা কেনার ব্যবসায়। ২০১০ সালে আমি বাংলাদেশে ফেরত আসতে বাধ্য হই বিশাল এক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। বাধ্য হয়ে আমার অধিকাংশ জমি ও অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য সম্পদ বিক্রি করে প্রায় সব ঋণ পরিশোধ করি। আমি ভাগ্যবান যে গ্রামে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার একটা বাড়ি আছে যেখানে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বর্তমানে বসবাস করছি। আমার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন সময় কাটে আমার গরুগুলির যত্ন নিয়ে এবং কৃষিকাজ করে। আমি আবার অর্থ সঞ্চয় করছি এবং পরিকল্পনা করছি আরও একবার বিদেশ যাওয়ার।

সবাইতো আর আমার মতো ভাগ্যবান নয়

জমির হোসেন

আমি জমির হোসেন। নোয়াখালী জেলার সিরাজপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমি ২০১৩ সালের ১৬ জানুয়ারি কনস্ট্রাকশন খাতে রাজমিস্ত্রির কাজ নিয়ে ওমানে যাই। ভেবেছিলাম মাস শেষ হলেই বেতন পাব কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাসের পর মাস যায়, আমার চাকরিদাতা কোন বেতন দেয় না। এভাবে পাঁচ মাস পেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় অর্থের অভাবে অন্যান্য বাংলাদেশী অভিবাসীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার ছিল না। একজন অভিবাসী আমাকে আব্দুল জব্বার নামে এক লোকের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। জব্বার আমাকে বাংলাদেশে অবস্থিত 'রামরু' অফিসে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। আমার সমস্যা জানার পর 'রামরু' পরামর্শ দেয় আমি যেন আমার কাগজপত্র এবং প্রমাণাদি যেমন পাসপোর্ট, ভিসা, চুক্তিপত্র ইত্যাদি নিয়ে ওমানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে যাই। এই পরিকল্পনা আমার মালিকপক্ষ থেকে গোপন রাখি। তারপরও, যে কোন উপায়ে সে জেনে ফেলে এবং আমি দূতাবাসে যেতে চাইলে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আমি আর দূতাবাসে যাই নাই। আমার সহকর্মী কেউ বিষয়টা তাকে জানিয়ে থাকবে। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে, চাকরিদাতা জানায়, আমার সব বকেয়া বেতন দিয়ে দেবে। সে আরও বলে, আমাকে বাংলাদেশে ফেরত যেতে সে সাহায্য করবে। আমি বকেয়া বেতন পেয়ে যাই এবং ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফেরত আসি। সবাই আমার মতো ভাগ্যবান নয়।

মাকড়শার মত চেষ্টা করেই চলেছি, একবার না একবারতো সাফল্য পাবোই

আব্দুল্লাহ আল-হাসান

আমি আব্দুল্লাহ আল-হাসান চট্টগ্রাম জেলার ফুলগাছিয়াপাড়ার বাসিন্দা। ২০১৩ সালে একজন দালালকে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে কাজের জন্য ওমানে যাই। এই টাকা যোগাড়

করেছিলেন আমার বাবা এবং বড় ভাই। বাবার কিছু সঞ্চয় ছিল এবং তার কিছু জমি তিনি লিজ দিয়েছিলেন কিছু বাড়তি আয়ের জন্য। আমার অভিবাসনের জন্য তার সেই বাড়তি অর্থটাও খরচ হয়ে যায়।

আমরা তিন ভাই এবং তিন বোন। মা মারা গেছেন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় ভাই স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ কুয়েতে বসবাস করত। অন্যান্য ভাইয়েরা গ্রামেই বসবাস করে। চাষাবাদ ও ছোট ব্যবসা চালায়। আমাদের কৃষিজমির ফসল দিয়ে পুরো পরিবারের চাহিদা মিটতো না।

এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি চাকরির চেষ্টা করি। ভেবেছিলাম একজন পুলিশ অফিসার হব এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। পরীক্ষা ছিল দুইভাগে বিভক্ত- লিখিত ও মৌখিক। আমি লিখিত পরীক্ষায় পাস করেছিলাম কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করি। তখন সিদ্ধান্ত নেই বাংলাদেশে না থেকে বিদেশে যেয়ে টাকা আয় করবো। তখন জানতাম বিদেশ গিয়ে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব, যা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কুয়েত সরকার সে সময় ভিসা অনুমোদন করছিল না। আমার ভাই কুয়েতে বসবাস করার পরও কোনো সাহায্য করতে পারে নাই।

এসব কারণে একজন দালালের সহায়তায় আমি ওমান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে জানায় যে আমার জন্য সেখানে সে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে। আমি ৩০ হাজার টাকা মাসিক বেতনে একটা দোকানে কাজ করতে পারবো। সে আরও বলেছিল কোম্পানি আমার থাকার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু খাবারের খরচ আমাকে দিতে হবে। যাই হোক, ওমানে এসে দেখি দালাল যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাস্তবে তা ছিল না। এখানে আমাকে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হবে। কনস্ট্রাকশনের কাজ আগে আমি কখনও করিনি। আমি ওমানে মাত্র পাঁচ মাস ছিলাম। প্রায়ই আমার কোনো কাজ থাকত না। আমি বেতন পেতাম দিনমজুরের মতো। এ কাজে শারীরিক পরিশ্রম যেমন বেশি তেমনি তা কঠিনও। সুতরাং দীর্ঘদিন একাজ করতে পারি নাই।

বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে আসি। কিন্তু এখনও কোনো চাকরি পাইনি। ইতিমধ্যে রামরু পরিচালিত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কথা জানতে পারি। এই কর্মসূচির সংবাদটা ছিল আমার জন্য একটা আশীর্বাদ। আমি ২০১৬ সালের ২০ মার্চ ৪৫ দিনব্যাপী ড্রাইভিং কোর্সে ভর্তি হই। গাড়ি চালনা বিষয়ক জ্ঞানসহ এ প্রশিক্ষণ থেকে আমি হাতে কলমে ড্রাইভিং শিখি। ওমান থেকে দেশে ফেরার সময়ই ভেবে রেখেছিলাম যেকোনো একটা কাজ শিখবো-প্লাম্বিং অথবা কারেন্ট মিস্ত্রির কাজ। ড্রাইভিং শেখার কথা ভাবিই নি। সম্প্রতি আমি বিদেশ যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি। যদি কাজটা নাও হয় বাংলাদেশেই ড্রাইভিং-এর কাজ করবো।

কাতার

আমার পরিবার আজ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে

মোহাম্মদ কায়েম

আমার নাম মোহাম্মদ কায়েম। আমরা মাওয়া এলাকার বাসিন্দা। ভিটেমাটি ও জমিজমা পদ্মায় বিলীন হয়ে যাওয়ায় অনেক আগেই আমরা গ্রাম ছেড়েছি। আমার বাবা ছিলেন একজন ড্রাইভার। ঢাকার করাইল বস্তিতে বাস করতাম। আমার বয়স যখন ১৫ বছর তখন বস্তিতে বড় ধরনের একটা কলহের ঘটনা ঘটে এবং একজন ছুরিকাহত হয়। তারপর পুলিশ আসে এবং আরও অনেকের সঙ্গে আমাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তিনমাস আমি জেলে ছিলাম। মামলা চলাকালীন বাবা অনেক টাকা খরচ করে আমার জামিনের ব্যবস্থা করে। তবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেতে আরও কয়েক বছর লেগে যায়। জেলে যাওয়ার আগে আমি সপ্তম শ্রেনিতে পড়তাম। আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার কারণে কোথাও কোনো চাকরিও পাই না। এ অবস্থায় বাবা ছাড়া পরিবারের সবাই আবার গ্রামে ফিরে যাই এবং এক চাচার বাড়িতে বসবাস শুরু করি।

আমাদের অন্য এক চাচা কাতারে থাকতেন। বাবার কষ্টকর পরিস্থিতি দেখে চাচা রাজি হলেন আমাকে কাতারে নিয়ে যেতে। শর্ত হলো তার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। সবাই রাজি ছিলাম। ফলে বিয়ে হয়ে যায় এবং ২০১৪ সালে আমি কাতারে চাচার কাছে চলে যাই। আমার চাচা স্থানীয় এক বাংলাদেশী দালালের কাছ থেকে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকায় একটা কনস্ট্রাকশন চাকরির ভিসা কিনেছিলেন। এই টাকার অর্ধেকটা দিয়েছিলেন চাচা। বাকি টাকার ব্যবস্থা করেন আমার বাবা। সেই থেকে আমি সেখানে কাজ করছি। প্রতি মাসে বেতন হিসেবে পাচ্ছি ২৫ হাজার টাকা। আমি আমার চাচার সাথে থাকি এবং মাসে ২০ হাজার টাকা দেশে পাঠাই ঋণশোধের জন্য। ঋণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমার ছোট ভাই বাংলাদেশে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে। ভাবছি তাকেও কাতারে নিয়ে আসব। এখানে এলে সে বাংলাদেশে যা আয় করে তার দ্বিগুণেরও বেশি আয় করতে পারবে। এই ভাবনা থেকে আমি দুটো ভিসা কিনেছিলাম- একটা আমার ভাইয়ের জন্য, আরেকটা গ্রামের কারো কাছে বিক্রির জন্য। ভিসা বিক্রির লাভের এক লাখ টাকা এবং আমার ভাই ও বাবার যোগাড় করা বাকি টাকা দিয়ে আমার ভাই এখানে এসেছে। দুই মাস হলো আমার ভাই আমার কাছে এসেছে। তার ভিসা তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাকে একটি দর্জির দোকানে কাজ দিয়েছি এবং সেখানে সে কাজ শুরু করেছে। আশা করছি দুই ভাইয়ের উপার্জনে আমাদের পরিবারের ভাগ্য ফিরবে। বাবা আমাদের জন্য সারা জীবনই কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এখন তার অবসর নেওয়ার সময়।

আজ আমি সুখি, পরিবার যা চায় তা দিতে পারি

মোহাম্মদ নিয়ামত উদ্দিন

আমি মোহাম্মদ নিয়ামত উদ্দিন। বাড়ি কুমিল্লা জেলার কুশিয়ারা গ্রামে। সম্প্রতি বিদেশ এসে কাজ করতে শুরু করেছি। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা আমিসহ ছয় জন। বাবা মাছের ব্যবসা করতেন। ছোট ভাই পড়ত মাদ্রাসায় আর ছোট বোন পড়ে দশম শ্রেনিতে। বাবার একার আয় পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। আমি সর্বত্রই কাজ খুঁজতাম কিন্তু দেশে কোনো কাজ পাই নাই। ফলে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। যে দালালের মাধ্যমে আমি বিদেশে কাজের সন্ধান পাই সে ছিল আমাদের আত্মীয়।

আমি ২০১০ সালের জুলাই মাসে ২৮ বছর বয়সে কাতারে অভিবাসী হই। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল তিন লাখ ৩০ হাজার টাকা। এ টাকা আমি যোগাড় করেছিলাম আত্মীয়-স্বজনের কাছে ঋণ করে। কাতারে আমি একটা প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি পাই এবং বর্তমানে সেখানে অফিস সহকারী হিসেবে কাজ করছি। উপার্জন করছি প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা। আমার চলার খরচের পরও বেশ কিছু টাকা জমা থাকে। সেই টাকা এনসিসি ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রামে পাঠাই। আমি দ্রুত ঋণ পরিশোধ করে ফেলেছি এবং এক বোনের বিয়ের যাবতীয় খরচ বহন করেছি। আমার পরিবার আগের চেয়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন জীবন পেয়েছে।

মধু রেনু সমাপয়েত

মোহাম্মদ হাসনাত

আমি মোহাম্মদ হাসনাত। বাড়ি কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার নাজিরপুর গ্রামে। এসএসসি পাশ করার পর টাকার অভাবে আর পড়ালেখা করতে পারি নাই। স্কুল ছেড়ে আসার পর থেকে আমি বেকার ছিলাম। তখন বিদেশে চাকরির কথা ভাবতাম। ঘটনাক্রমে এমআরপিসি আয়োজিত উঠান বৈঠকে জানতে পারি যে যদি কাজ শিখে বিদেশ যাই তাহলে বেশি বেতনের চাকরি পাওয়া যাবে। প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে। তারপর আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ঢাকায় এসে 'প্লাম্বিং'-এর কাজ শিখি। এরপর আমার এক আত্মীয় আমাকে কাতারে চাকরির একটা ভিসা পাঠায়। ভিসার জন্য সে তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। আমার পরিবারের পক্ষে এতো টাকা জোগাড় করা সম্ভব ছিল না।

ভিসার জন্য টাকার জোগান দিতে না পারায় আমার পরিবার চরম সংকটে পড়ে। আখতারুজ্জামান নামে এমআরপিসি-র এক সদস্যের সঙ্গে আমার বাবার যোগাযোগ থাকায় তিনি তার সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করেন। তার পরামর্শ নিয়ে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে আমি আমার বাবার সঙ্গে কুমিল্লার সিসিডিএ-র অফিসে যাই। তাদের সহায়তায় আমি কুমিল্লা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা অভিবাসন ঋণ নেই। সেই মাসেরই ১৫ তারিখে কাতার চলে যাই। তখন থেকেই আমি কাতারে কাজ করছি। বর্তমানে মাসে ২০ হাজার টাকা আয় করি। আমার আয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলতার সাথে এখন সংসার চলে। বর্তমানে আমি ছুটিতে

দেশে এসেছি। আশা রাখি কিছু ধানী জমি কেনার। উত্তম সূচিত্রার সিনেমায় যেমন সব কষ্টের পরে তাদের মিল হয় আর পর্দায় লেখা ওঠে মধু রেনু সমাপয়েত, আমারও তেমন অনেক পথ পেরিয়ে হ্যাপি এনডিং!

সৌদি আরব

মরার উপর খাড়ার ঘা!

আব্দুল নাছিম ফকির

আমি আব্দুল নাছিম ফকির। গোপালগঞ্জ শহরের বাসিন্দা। কাজের উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে সৌদি আরবে যাই। ভিসা যোগাড় করেছিলাম দালালের মাধ্যমে। দালাল ওয়াদা করেছিল আমাকে প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু আমাকে একটা কোম্পানিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। যে পরিমাণ বেতন দেয়ার কথা ছিল তা দেয়া হতো না।

আমি আমার ভিসার ধরন বিষয়ে কিছুই জানতাম না। একদিন ট্রাফিক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর জানতে পারি যে অন্য একজনের ভিসায় আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। ফলে শাস্তি হিসেবে আমার ১১ মাসের জেল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমার পরিবারের কিছুই করার ছিল না। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি দালালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু তার কোনো ফল পাইনি। যে কোম্পানিতে আগে কাজ করতাম সেখানে আমি আবার ফিরে যাই। তারা আবার আমাকে কাজ করার অনুমতি দেয় কিন্ত বেতন দেয় খুবই কম। অবশেষে ২০০৮ সালে সামান্য সঞ্চয় নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসি। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ এতটাই কম ছিল যে কোনো ব্যবসা শুরু করার জন্যই তা যথেষ্ট ছিল না। আশা করছি আবার বিদেশ যাব। এবারে আরও বেশি সতর্ক থাকব এবং নিশ্চিত করবো সব কিছু যেন ভালোভাবে হয়। ইচ্ছা আছে, দেশ ছাড়ার আগে আরও কিছু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবো। যা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারবে।

আমিও সাঁতরাইতে নামলাম আর নদীও পাথাইরা হইলো

আব্দুল বাশার

ভয়াবহ দারিদ্র্যের ভেতরে বসবাস করছিল আমার পরিবার। আমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। কাজের জন্য বিদেশ যাওয়া ছাড়া আমারও কোন গত্যন্তর ছিল না; সহায়সম্পত্তি যা ছিল তা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর কোনোভাবেই এরকম দারিদ্র্যের ভেতর জীবনযাপন করতে চাইছিলাম না। তাই পারিবারিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অভিবাসনের সুযোগ খুঁজতে থাকি। অবশেষে ১৯৮৮ সালে ৫৫ হাজার টাকা খরচ করে কুয়েত যাই। খরচ যোগাড় করেছিলাম মহাজন এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করে। আমার এক চাচাতো ভাই সে সময় কুয়েতে ছিল এবং সে আমাকে সাহায্য করেছিল।

আমাদের এলাকায় একটা প্রবাদ আছে: "নদী পার হতে সাঁতার শুরু করলাম। যত সাঁতরাই, নদীর তীর তত দূরে সরে"। আমার অভিবাসনের ক্ষেত্রে কথাটি মিলে গিয়েছিল। অভিবাসনের এক বছরের ভেতরেই ইরাক ও কুয়েতের মধ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আমরা বেপরোয়াভাবেই প্রথমে পায়ে হেঁটে, তারপর গাড়িতে কুয়েত থেকে পালাই এবং বাংলাদেশে ফেরত আসতে সক্ষম হই। ঋণের টাকা তখনও শোধ করতে পারিনি। ফিরে এসে উপযুক্ত

কোনো কাজও যোগাড় করতে পারিনি। ফলে আবার বিদেশ যাই একটা রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে। এবার যাই সৌদি আরবে। আমি আমার যৌবনের ১৪ বছর সৌদি আরবে কাটিয়েছি। আমার না ছিল কোনো শিক্ষা না ছিল কোনো দক্ষতা। দীর্ঘ সময় সেখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করেছি। বেশি না হলেও বেতনটা নিয়মিত পেতাম। এ সময় জানতে পারি আমার ছোট ভাই এলাকার খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতে শুরু করেছে। একটা ভিসা কিনে ২০০৩ সালে ছোট ভাইকে সৌদি আরবে নিয়ে যাই। বছর দুয়েক পর বাংলাদেশে ফেরত আসি এবং আরেক ভাইকে সৌদি আরব পাঠাই। দুই ভাইকে সৌদি আরবে পাঠানোটা ছিল আমার অভিবাসী-জীবনের প্রধান বিনিয়োগ।

আমার স্বপ্ন ছিল নিজেদের জন্য একটু জায়গাজমি করা। স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের কাছাকাছি আঠারো ডেসিমেল জমি কিনেছি। বর্তমানে স্থানীয় বাজারে আমার তিনটে দোকানভাড়া দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেও চা ও কোল্ড ড্রিংকস এর একটা দোকান চালাই একই বাজারে। দোকানে দুইজন লোককে চাকরি দিয়েছি আমাকে সাহায্য করার জন্য। এটা সত্য যে সৌদি আরবে থাকার সময় কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু আমি শিখেছিলাম কিভাবে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কোনোদিন ভাবিনি যে আমার একটা ব্যাংক একাউন্ট হবে। ছুটিতে দেশে এসে বাবার নামে একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলেছিলাম রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য। সেই থেকে ব্যাংকের সঙ্গে আমার লেনদেন কখনই বন্ধ হয় নাই। বর্তমানে যৌথভাবে আমাদের তিন ভাইয়ের সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৯৯ লাখ টাকা। দেশে থেকে তিনজন মিলে দিনরাত পরিশ্রম করলেও এতো সম্পদ করার কথা স্বপ্নেও দেখতাম না। ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকালে মনটা খারাপ হয়ে যায়। আবার তৃপ্তিও লাগে। পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছি।

বদলে গেছে নিজের দিন, ইচ্ছা হয় অন্যদেরটাও বদলে দেই

সিরাজউদ্দিন মিন্টু

এইচএসসি পাশ করার আগ পর্যন্ত আমার জীবনে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছিল। কিন্তু এ সময় হঠাৎ আমার বাবা মারা যায়। বাবা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাবার মৃত্যু পুরো পরিবারকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। প্রতিদিনই দিনগুলি খারাপ হতে থাকে। তখন সিদ্ধান্ত নেই কিছু একটা করতে হবে। আমাদের অনেক প্রতিবেশী সৌদি আরবে অভিবাসী হয়েছিল। আমার এক বন্ধু লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য শহরে চলে গেল। যাওয়ার সময় সে জিজ্ঞাসা করল আমি সৌদি আরবে কাজ করতে আগ্রহী কিনা। তখন থেকেই এই সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না এই সবকিছুর জন্য কিভাবে আমি অর্থের ব্যবস্থা করব।

এক পর্যায়ে সৌদি আরব যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঋণের ব্যবস্থা করলাম। আমার বন্ধুর বাবাও কিছু টাকা ঋণ দিলেন। আমি সৌদি আরব গিয়ে ঠিকমতো পৌঁছালাম এবং একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি পেলাম। খুবই কম বেতনে। চেয়েছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সব

পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে। পরিবারকে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে। জানতাম একবার দেনামুক্ত হতে পারলে নিয়মিত দেশের বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারব। ওরা ভালো থাকবে। প্রথম দিকে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাতাম। তবে কিছুদিন পর ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাতে শুরু করি। আমার পাঠানো টাকায় পরিবার চলতো। এদিকে আমি কিছু সঞ্চয়ও করি। যা দিয়ে দেশে ফিরে কিছু জমি কিনি। তখন জমির দাম ছিল দেড় লাখ থেকে দুই লাখ টাকা। দেশে ফিরে আসার পর বড়োতাকিয়া বাজারে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলি। বাড়ি বানিয়েছি ৭০ হাজার টাকা খরচ করে। আমি সৌদি আরব ছিলাম নয় বছর। সৌদিবাসের অভিজ্ঞতা ও উপার্জন আমার জীবনকে বদলে দেয়। এখন আমি অন্যদের জন্য কিছু করতে চাই। আমি আমার দেশের মানুষের সাথে সেইসব শিক্ষা ও সমৃদ্ধির কথা ভাগাভাগি করতে চাই, যা আমি বিদেশে কাজ করার সময় অর্জন করেছি।

ভাগ্য বিধাতা সদয় ছিলেন

নাজিমুদ্দিন

বিদেশ যাওয়ার জন্য আমি সবকিছু করেছিলাম। এমনকী বাপদাদার জমিও বিক্রি করেছিলাম। আমার বড় ভাই বিয়ের সময় তার শ্বশুরের কাছ থেকে যৌতুক নিয়েছিল আমার বিদেশ যাওয়ার খরচ জোগাতে। কিন্তু সে অর্থ যথেষ্ট ছিল না। তাই ঋণ করার প্রয়োজন পড়েছিল। টাকা দিয়ে সাহায্য করার মতো অবস্থা আমার পরিবারের ছিল না। কারণ, আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। আমি বিদেশ গিয়েছিলাম টাকা আয় করতে। পরিবারকে ভালো রাখতে।

সৌদি আরবে যেতে আমার খরচ হয়েছিল এক লাখ ২০ হাজার টাকা। জীবনের তের বছর সেখানে কাটিয়েছি। আমি সেখানে কাজ করতাম সেলস্‌ম্যান হিসেবে। বিদেশ যাওয়ার তিন বছরের ভেতরে সব ঋণ শোধ করে দেই। এরপর আমি আমার ভাইকে সেখানে নিয়ে আসি। তারপর আরও দশজন বাংলাদেশীকে সৌদি আরব যেতে সাহায্য করি। তাদের কাজের ব্যবস্থাও করে দেই। ভাইকে পাশে পেয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সহজ হয়ে যায়। আমরা দুজন নিয়মিত দেশে টাকা পাঠাতে থাকি। ফলে আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। আমার বাবা একশ ডেসিমেল জমি কেনেন। সেই জমির ওপর আমরা বাড়ি বানিয়েছি। একই জমির বাকি অংশে চাষাবাদ করছি। সেখানে একটা পুকুর থাকায় মাছের চাষও চলছে। সত্যি বলতে কি এই জমি এখন আমাদের পরিবারের আয়ের উৎস ।

পনেরো বছর সৌদি আরবে থাকার পর বাংলাদেশে ফিরে এসে নিজেকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। এলাকায় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চালু করেছি। এই স্টোর থেকে ভালো আয় হয়। এই ষ্টোরের আয় এতটাই ভাল যে, তা থেকে দুটো বাস কিনে পরিবহন ব্যবসা শুরু করেছি। পরিবহন ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় হয়। আমাদের যাবতীয় সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। আমার ব্যবসায়ে ৬-৭ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এইসব সাফল্য হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময় মূল্য। সৌদি আরবে থাকার সময় আমার চাকরিদাতা আমাকে মারধোর করেছে, অশ্লীল গালাগালি দিয়েছে। কিন্তু

আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছুই গায়ে লাগাই নি। এখন আমি বাংলাদেশে ফেরত এসেছি এবং আমার কঠোর পরিশ্রমের সুফল ভোগ করছি। পেছনে ফিরে তাকানোর আর কোনো প্রয়োজন নাই।

কষ্ট করিলে কেষ্ট মিলে

মোহাম্মদ হাশেম

আমি ১৯৮৮ সালে দুবাই গিয়েছিলাম। তখন বয়স ছিল তিরিশের কোঠায়। লাগাতার অর্থাভাব আমার পরিবারকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। নানান আর্থিক সমস্যার ভেতর দিয়ে আমাদের দিন কাটতো। এ অবস্থাই আমাকে উৎসাহিত করেছিল বিদেশ যেতে, যেন পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারি। দুবাই পৌঁছানোর পর ভালো বেতনের কোনো কাজ আমি পাইনি। তাই অন্য কোনো পছন্দ না থাকায় দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেই। এভাবে কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর আবার বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা জাগে এবং সৌদি আরবে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যাই।

সৌদি আরবে এসে এখানে-সেখানে বিভিন্ন কাজ করতাম। কোনো স্থায়ী চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফলে বেশি টাকা আয় করা সম্ভব হচ্ছিল না। একসময় লক্ষ্য করলাম কিছু লোক সবজি বিক্রি করছে। সুতরাং আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম সবজি বিক্রি করার এবং সবজির ব্যবসা লাভজনক প্রমাণিত হলো। সবজি বিক্রি করে মাসে প্রায় আটশ সৌদি-রিয়াল আয় হতে লাগলো। এবার আমার রোজগার থেকে পরিবারে টাকা পাঠাতে শুরু করলাম। নিজের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য বাড়তি কিছু টাকাও রোজগার হতে লাগলো। আমার সঞ্চয় থেকে দেশে কিছু জমি কিনে বাড়ি বানানো হলো। আমার ছেলেকেও সৌদিতে নিয়ে গেলাম। তাকে সৌদি আরবে প্রতিষ্ঠিত করে আমি দেশে ফিরে এলাম।

দেশে এসে দেখলাম আমার প্রতিবেশীরা মুরগির খামারের ব্যবসা করে ভালো আছে। আমিও বাড়ির কাছাকাছি জমিতেই শুরু করলাম মুরগির খামার। আমার ছেলেও বাংলাদেশে ফিরে খামার-ব্যবসায় মনোযোগ দেয়। মুরগি বেচাকেনার ব্যবসা আমাদের ভালো চলছে। আমি বিদেশ গিয়েছিলাম পরিবারের দারিদ্র দূর করতে এবং আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে তা আমি পেরেছি। আমি ভাগ্যবান যে সবকিছু ভালোভাবে করতে পেরেছি। সৌদি আরবে বহু অভিবাসীকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে দেখেছি। আমার কঠোর পরিশ্রম আমাকে বিদেশ ও দেশে দু'জায়গাতেই সফল হতে সাহায্য করেছে। আমি এবং আমার ছেলে বাংলাদেশে এখন সুখে আছি। আমাদের আর বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা নাই।

সৌদি গেলাম, সিঙ্গাপুর গেলাম কিন্তু সফলতা এলো এই পোড়া বাংলাদেশে

মোহাম্মদ ইদ্রিস

যখন বেকার ছিলাম তখন প্রতিবেশীদের অনেককেই বিদেশে যেতে দেখতাম। মনে মনে ভাবতাম টাকা আয় করতে আমারও উচিত বিদেশ যাওয়া। অবশেষে ১৯৯১ সালে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সিঙ্গাপুরে যেতে আমার কেনো সমস্যা হয়নি। তবে পৌঁছানোর পর চাকরিদাতার প্রতারণার শিকার হই। আমাকে মাসিক পাঁচশ সিঙ্গাপুরি ডলার বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয় মাত্র তিনশ ডলার। দালাল হোটেলে কাজ করার কথা বলে সিঙ্গাপুরে পাঠালেও কাজ পেয়েছিলাম কনস্ট্রাকশনের।

যেহেতু ঋণ করে বিদেশ গেছি তাই মনে প্রচন্ড ক্ষোভ থাকলেও দালালের প্রতারণার প্রতিবাদ করিনি। চাকরিটা চালিয়ে গেছি। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে কাজ করে দেশে ফিরে আসি। মনে মনে নিজেকে বলি: আর কখনও সিঙ্গাপুরে যাব না। দেশে ফেরার ২৩ দিন পর সৌদি আরবে যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত হয়। এবারও যেতে কোনো সমস্যা হলো না। এখানেও চাকরিতে বেতন কম। চাকরির চুক্তি অনুসারে বেতন দেওয়ার কথা ছিল মাসে ছয়শ সৌদি রিয়াল, কিন্তু দেওয়া হয় মাত্র তিনশ ২০ রিয়াল। দালাল বলেছিল, আমি ডাকপিয়ন হিসেবে কাজ করব, কিন্তু আসার পর বলা হলো ক্লিনারের কাজ করতে। এখানেও বাধ্য হয়ে আমি এ কাজ করেছি। কারণ করার কিছুই ছিল না। তিন বছর সৌদি আরবে কাজ করেছিলাম। তারপর বাংলাদেশে ফিরে আসি। সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে একটা বাড়ি ও কিছু জমি কিনেছি। একটা গরুর খামারও করেছি।

খামার বিষয়ে তেমন কিছুই জানতাম না আমি তবে শিখে নিয়েছি। এখন আমার খামারে গরুর সংখ্যা ২৪টি। প্রতিদিন তিনশ লিটার দুধ হয়। যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে বছরে আমার পাঁচ থেকে ছয় লাখ টাকা আয় হয়। খামার-ব্যবসা ভালোই চলছে। বিদেশ যাওয়ার আর দরকার নাই। এখন আমার সন্তানদের লালনপালন ও তাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়েছি।

সব কিছুই ঠিকমতো হয়েছে, কোথাও আটকাইনি

মোহাম্মদ মারুফ আলী

আমি এমন একটা পরিবারের সদস্য যেখানে সবকিছুর জন্যই সংগ্রাম করতে হতো। আমার বাবা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। কিন্তু তার আয়ে পরিবারের চাহিদা মিটত না। মাঝে মাঝে মনে হতো আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব। আমি পরিবারের বড় সন্তান। ফলে পরিবারের জন্য কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করতাম। পরিবারের এই অবস্থা নিয়ে বহু ভেবেছি, কিন্তু যদি বাংলাদেশে থাকি তাহলে যথাযথভাবে ভাইবোনের যত্ন নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। দেশে তেমন কোনো কাজের সুযোগও পাচ্ছিলাম না। কী করার আছে আমার? দিনমজুর হয়ে যাব নাকি দোকানদার? কিন্তু এসবে তো এমন কোনো আয় হবে না যা দিয়ে সংসার চালানো যাবে। সে কারণে সিদ্ধান্ত নিলাম অভিবাসনই আমাকে অধিক উপার্জনে সাহায্য করবে।

তথ্য জোগাড় করা শুরু করলাম কিভাবে বিদেশ যাওয়া যায়। অবশেষে সৌদি আরবে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পেলাম। সেটা ছিল ১৯৮৬ সাল। প্রথম দিকে আবাসিক এলাকার বাসভবনে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি। তারপর একটা হোটেলে কাজ শুরু করলাম। এর থেকে ভালো চাকরি যোগাড় করা সম্ভব হলো না। আমার কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছিল না, কিন্তু আমি কাজের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেই এবং প্রতি মাসে আয় করি এক হাজার সৌদি রিয়াল। ষোল বছর পর ২০০২ সালে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি।

বিদেশ থাকাকালীন আমার দুই ভাইসহ কয়েকজন আত্মীয়কে সৌদি আরব নিয়ে যাই। বর্তমানে তারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত। সঞ্চিত টাকা দিয়ে আমি কিছু গবাদিপশু কিনেছি। কিছু জমিও কিনেছি যেখানে মৌসুমি ফসলের চাষ করছি। আমার খামারে ১২ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এলাকায় কিছু বেকার মানুষকে চাকরি দিতে পারার জন্য গর্ব অনুভব করি। অভিবাসন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। পরিবারে আর্থিক স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করেছে সেজন্য আমি আনন্দিত।

‘আমার ঘামে আয় হয়েছে হাজার হাজার রিয়াল’

হাজী মোহাম্মদ ইলাহী

এইচএসসি পাশ করার পর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। আর্থিক সমস্যার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। সব সময় মনে হতো আমি কিছুই করতে পারবো না! সেই কঠিন সময়ে আমার পরিবারকে সাহায্য করারও কেউ ছিল না। সরকারি সাহায্য পাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না। এ অবস্থায় কেবলই মনে হতো যে, চাকরি নিয়ে বিদেশ যেতে পারলে জীবনে উন্নতি সম্ভব। কিন্তু বিদেশ যাওয়ার জন্য টাকা যোগাড় করা আমার জন্য কঠিন ছিল। তবু অনেক চেষ্টার পর আমি সৌদি আরবে অভিবাসন করেছিলাম ১৯৮১ সালে ।

সবাই বলে যে, আমি ছিলাম বুদ্ধিমান এবং সেই বুদ্ধিই আমাকে সাহায্য করেছে। দোকানে সেলস্‌ম্যানের একটা চাকরি হয়। যদিও এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ আমার ছিল না। প্রতি মাসে এক হাজার সৌদি রিয়াল আয় করতাম। ব্যাংকের মাধ্যমে কিছু টাকা দেশে পাঠাতাম। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল এবং প্রায়ই আমি দেশে আসতাম পরিবারের সাথে সময় কাটাতে। আমার জীবনের ২৭টি বছর কাজ করেছি সৌদি আরবে। দেশ ও পরিবার থেকে দূরে ছিলাম এবং আমি প্রকৃত অর্থেই বসবাস করতাম মরুভূমিতে। মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি কেন আমি এসব করেছিলাম? অবশ্যই এসব করেছিলাম অর্থের জন্য। পরিবারের উন্নতির জন্য এই দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নিয়েছিলাম। আমি ২০০৭ সালে দেশে ফিরে আসি। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কিছু জমি কিনেছি এবং একটা দুইতলা বাড়ি বানিয়েছি। ফলের বাগান এবং চাষের জমি থেকেও আমার ভালোই আয় হয়। স্থানীয় বাজারের কাছেই একটা স’মিল করেছি। কাঠ বিক্রি করে লাভ থাকে। একই সাথে গ্রামের কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। আমি ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সাহায্য করেছি। যা আমাকে খুবই আনন্দ দেয়।

শুধু নিজের ভালোতে মন ভরে না

শাহনেওয়াজ

আমি শাহনেওয়াজ। বিদেশ যাওয়ার আগে আমার পরিবার চালানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। অবস্থা ফেরাতে ১৯৮৩ সালে আমি দেশ ছেড়ে সৌদি আরবে যাই। অভিবাসনে খরচ হয়েছিলো ৪০ হাজার টাকা। আমি সৌদি আরবে চব্বিশ বছর রঙ মিস্ত্রির ঠিকাদার হিসেবে কাজ করেছি।

অনেক দিন সেখানে থাকার কারণে ভালো সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। সঞ্চয় দিয়ে বাংলাদেশে শুরু করেছিলাম কয়েক ধরনের ব্যবসা। বিদেশ যাওয়ার আগে আমি কোনো প্রশিক্ষণ নেই নাই। প্রশিক্ষণ থাকলে আরও ভালো কাজের সুযোগ পেতাম। যাইহোক, আমার জন্য অনেক সুযোগ সেখানে ছিলনা।

আমার সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সিতারগঞ্জ কলেজের কাছাকাছি একটা দুইতলা বাড়ি বানিয়েছি। খরচ হয়েছে ২০ লাখ টাকা। সেই বাড়িতেই এখন বসবাস করি। বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিয়েছি। কিছু বাড়তি আয় হয়। এছাড়া ২৬ ডেসিমেল জমি কিনেছি এবং সেখানে একটা মুরগির খামার করেছি। আমার একটা মাছের পুকুরও আছে। আমার যাবতীয় সম্পদের বর্তমান মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। কঠোর পরিশ্রম ও কৌশলী সিদ্ধান্তের কারণে আমি বর্তমানের অবস্থান অর্জন করেছি। অভিবাসন কেবল আমার আর্থিক স্থিতিশীলতাই আনে নি, এলাকার লোকেরাও এর সুফল পাচ্ছে। প্রায় ৩০ জন লোকের কাজের সংস্থান করেছি। বিদেশে যেয়ে কেবল টাকা কামালেই হবে না। উপার্জিত টাকা দেশে বিনিয়োগের পরিকল্পনাও থাকতে হবে। আর জানতে হবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল, আর তাহলেই উন্নতি সম্ভব হবে।

পাট যেমন সোনার ফসল, আমি তেমনি বাংলাদেশের সোনার সন্তান

মোহাম্মদ এন্তাস হোসেন

টাঙ্গাইলের করটিয়া উপজেলার ভাতকুড়া গ্রামে এক গরিব পরিবারে আমার জন্ম। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বারো জন। এই বারোটি মুখের খাবারের ব্যবস্থা করতে না পেরে বাবা আমাকে তের বছর বয়সেই তাঁত কারখানায় কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। আমি ভালো ছাত্র ছিলাম, কিন্তু নতুন কাজের দায়িত্বের কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারিনি। তাই মনে একটা কষ্ট ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁত কারখানায় কাজ করতে করতে প্রায় ভাবতাম: একদিন এরকম একটা কারখানার মালিক হব আমি।

ঘটনাক্রমে ১৯৯০ সালে কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দ্রুত ভাষা শিখে ফেললাম এবং একটা চাকরি পেলাম। পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর এক ছুটিতে ফিরে এলাম বাংলাদেশে। পরিবারের জন্য কিনলাম তিন খণ্ড জমি। তারপর সৌদি আরবে গিয়ে আরও পাঁচ বছর কাজ করলাম। ফিরে এসে লেগে গেলাম স্বপ্ন পূরণের কাজে। এক একর জমির উপর ৩৬টি মেশিন দিয়ে তাঁত কারখানা বসালাম। আমার কারখানায় দৈনিক দেড়শ থেকে দুইশ শাড়ি তৈরি হতে লাগল। প্রায় দুইশ জন তাঁতকর্মী

এখন আমার কারখানায় কাজ করছে। পাইকারি বিক্রেতারা আমার কাছ থেকে শাড়ি কেনে এবং তা সরবরাহ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রায় ভূমিহীন অবস্থা থেকে আমার পরিবার এখন পাঁচ একর কৃষিজমির মালিক। ইতিমধ্যে মাছচাষ ও গরু মোটাতাজাকরণের উদ্যোগ নিয়েছি। শুধুমাত্র নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করেই থেমে যাইনি। আমার দুই ভাইকে মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবে পাঠানোর খরচও আমি দিয়েছি। এছাড়া আমার আরেক ভাইকে একটা কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছি। আমার অভিবাসনের সাফল্যের কারণে রামরু আমাকে "সোনার মানুষ" পুরস্কার দিয়েছে। এ পুরস্কার হাতে তুলে দেয়ার সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন: পাট যেমন বংলাদেশের সোনার ফসল, অভিবাসীরা তেমন বাংলাদেশের সোনার সন্তান।

সমাজ এখন আমার কথাকে দাম দেয়

মোহাম্মদ কাদের

আমি ১৯৮৬ সালে সৌদি আরবে কাজ করতে গিয়েছিলাম। কঠিন হলেও একটানা ষোল বছর সৌদি আরবে থেকেছি। শুরুতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করলেও, পরে একজন ওয়েল্ডার হিসেবে নিজেকে তৈরি করি। সৌদি আরবে থাকাকালীন আমি কখনই নিজেকে তাদের সমাজের কেউ বলে অনুভব করতে পারি নি।

ঢাকার নওয়াবগঞ্জের বাসিন্দা আমি। দেশ ছেড়েছিলাম যেন নিজের পরিবারের জন্য উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে পারি। ২০০২ সালে ফিরে আসার পর স্থানীয় বাজারে দোকানের ব্যবসা চালু করে সফলতা লাভ করি। সমাজের মানুষ আমাকে একজন বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে আমার ভাইয়েরা সাহায্য করেছিল। সেখান থেকে এখন প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা আয় হচ্ছে। পরিবারের লোকেরা যে যখন সময় পায় তখনই দোকানের দেখাশোনা করে। আমি ২০ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। সম্প্রতি আমি যুবলীগের সেক্রেটারি হিসেবে সেবা দিতে শুরু করেছি। সমাজ এখন আমার কথাকে দাম দেয়। এখন আমি সমাজের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম।

এখন, আমিই হলাম বস!

জিয়া হোসেন

আমি নয় ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম। বড় পরিবার হওয়ায় অভাব অনটন ছিল সবসময়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার আউলটিয়া গ্রামে আমার দেশের বাড়ি। বেশি আয় করার জন্য বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পরিবারের দুর্দশা আমাকে দিশাহারা করে দিয়েছিল। ১৯৯৯ সালে আমি একটা চাকরি নিয়ে সৌদি আরব চলে যাই।

সৌদি আরবে নয় বছর কাজ করার পর ২০০৮ সালে দেশে ফিরে আসি। ফিরে আসার পর যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে একটা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেই। তারপর শুরু করি কৃষিবিষয়ক প্রকল্প।

বিভিন্ন ধরনের বীজ কিনে তিনশ ডেসিমেল জমির ওপর তৈরি করেছি এক বিশাল বাগান। বর্তমানে বহুলোক আমার বাগান দেখতে আসে। চারাগাছ ও জমির পরিচর্যার জন্য বাগানে চারজন লোক রেখেছি। তাছাড়া একটা ওষুধের দোকানও খুলেছি। আমার কর্মচারির সংখ্যা বর্তমানে সাতজন। একটা পাকা বাড়ি বানিয়েছি। এসব উদ্যোগ আমার পরিবারকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করেছে।

জীবন এখন চলে, আশি মাইল স্পীডে

আবদুল কাইয়ুম

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় আমার বাড়ি। খুবই গরিব পরিবারে জন্মেছি। লেখাপড়া শেখার কোনো সুযোগ ছিলনা। এমনকি বিদেশে যাওয়ার মতো সামর্থ্যও ছিল না। তবে চেষ্টা থামিয়ে দিইনি। ১৯৯০ সালে আমি সৌদি আরব যাই। বাড়ি বিক্রি করে বিদেশ যাওয়ার টাকা জোগাড় করি। তারপরও কিছু টাকা ঋণ করেছিলাম আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় একটা এনজিও থেকে। সৌদি আরবে আমি একটা গাড়ির গ্যারেজে কাজ শুরু করি। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেখানে টিকে থাকার জন্য। তবে নিয়মিত বেতন পেয়েছি। সেখানে প্রায় ১২ বছর কাজ করার পর ১৯৯৮ সালে দেশে ফেরত আসি। ততোদিনে আমি কিছু টাকা সঞ্চয় করেছি। দেশে ফেরত এসে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং চালু করি একটা গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ। সেখানে আমি পনেরো জন লোকের কর্মসংস্থান করেছি। কিছু কৃষিজমি কিনেছি। আমার স্বপ্ন গ্যারেজে নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে ব্যবসাটাকে বড় করে বেশি লোকের কর্মসংস্থান করা।

অভাবের দিনগুলি এখন অনেক দূরে

শরীফুল রহমান ঠান্ডু

আমি টাঙ্গাইল জেলার সিংগাইর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পারিবারিকভাবেই আমাদের রাজনৈতিক জগতের সাথে যোগাযোগ ছিল। প্রকৃত অর্থেই, আমি চাইতাম মানুষের সাহায্য করতে, কিন্তু মানবসেবা তো দূরের কথা নিজের সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছিলাম। মানুষের জন্য কিছু করবো কিভাবে!

এমন সময় একজন দালালের সাথে কথা বলে বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। পরিবারও রাজি হয়। কোনো রকমে টাকাপয়সা যোগাড় করে সৌদি আরবে চলে যাই। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে ভালো বেতনের একটা চাকরিও পাই। পাঁচ বছর সৌদিতে থেকে দেশে ফিরে আসি। আমার ছেলেকেও সেখানে নিয়ে যাই। সৌদিতে থাকার সময়ই মেয়েটারও একটা ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেই। উপার্জিত টাকা সঞ্চয় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে পরবর্তীতে পরিবারটিকে ভালোভাবে চালাতে পারি।

বর্তমানে আমার একটা অগভীর নলকূপ আছে। যা দিয়ে কৃষিসেচ দেওয়ার ব্যবসা করি। জমি খননের একটা যন্ত্রও আমার আছে। এছাড়া মাছচাষসহ গবাদিপশুর খামার করেছি। স্থানীয়

বাজারে একটা দোকান আছে যা ভাড়া দিয়েছি। কনস্ট্রাকশন খাতের সাথেও যোগাযোগ আছে আমার। এলাকায় জনকল্যাণমূলক কাজের সাথেও যুক্ত হয়েছি। আমার ব্যবসায় বর্তমানে নয়জন লোক নিয়মিত কাজ করছে। এখন আমার দিনগুলো ভালোই কাটছে এবং অভাবের দিনগুলি থেকে এখন আমরা অনেক দূরে। ভবিষ্যতে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার স্বপ্ন দেখছি আমি।

'সকল বাধা তুচ্ছ করে ফুটবো আমি ফুটবো গো'

মোহাম্মদ আতাউর হোসেন

টাঙ্গাইল জেলার খরশিলা গ্রামের এক গরিব পরিবারের সন্তান আমি। একদিন কালিহাতীর কাছাকাছি একটি বাজারে একজন রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে পরিচয় হয়। তার সাথে আলাপ করে মনে হলো কোন পরিশ্রম ছাড়াই যেন সৌভাগ্য আমার দরজায় কড়া নাড়ছে। তার পরামর্শ অনুযায়ী সৌদি আরব যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। পরিবারের লোকেরা বিষয়টা ভালো চোখে দেখে নাই। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত না বদলিয়ে পরিবারের সকল বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হই। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করে এবং নিজের কিছু জিনিস বিক্রি করে বিদেশ যাওয়ার খরচ যোগাড় করি।

সৌদি আরব পৌঁছানোর পর নিয়মিত ও ভালো বেতনের একটা চাকরি পেয়ে যাই। আমি কঠোর পরিশ্রম করতাম। সুযোগ পেলেই অতিরিক্ত সময়ও কাজ করতাম। সে কারণে অধিক অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। দেশে ফিরে আসার পর নিজের শহরে কিছু জমি কিনেছি। বাজারে একটা দোকান কিনে ভাড়া দিয়েছি। নিজেও একটা মুদির দোকান চালাই। সেখানে দুইজন কর্মচারি কাজ করে। বাড়তি আয়ের জন্য দুটি সিএনজি কিনে ভাড়া দিয়েছি। পাশাপাশি মাছের চাষ করছি। পরিবারের জন্য একটা বাড়ি বানিয়েছি। আমি শুধু বিনিয়োগের দিকেই মনেযোগ দেই নাই, সঞ্চয়ও করছি। ব্যাংকে আমার বেশ কয়েকটি সঞ্চয়ী হিসাব আছে। প্রতি মাসে খরচ ছাড়াই সঞ্চয় হচ্ছে এক লাখ টাকা। এলাকায় নয়জন লোকের কর্মসংস্থান করতে পেরেছি। আমি মনে করি আমার আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা আমাকে এ সাফল্য এনে দিয়েছে।

আমার কথা যদি শোন, কেউ স্বপ্ন দেখা বন্ধ করোনা

মোহাম্মদ সাদেকুল হোসেন

টাঙ্গাইল জেলার সহদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা আমি। বাবা একজন কৃষক এবং তিনি নিজের জমি চাষ করার পাশাপাশি বর্গাজমিও চাষ করতেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তিনি। আমি বিদেশ গিয়ে কাজ করে পরিবারকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলে বাবা বলেন: টাকা কোথায় পাবে, কে দেবে আমাদেরকে ঋণ? তিনি বরং আমাকে তার কৃষি কাজে সাহায্য করার কথা বলেন। তার কথা আমি মেনে নেই।

কয়েক বছর পর আমার চাচা আমাকে বিদেশে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে থাকে। চাচার

সহযোগিতায় অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করে স্বপ্ন পূরণের জন্য চলে যাই সৌদি আরব। বেশ কিছুদিন সেখানে কাজ করে দেশে ফিরে আসি। জমানো টাকা দিয়ে প্রথমেই কিছু জমি কিনি। এরপর শুরু করি ডেকোরেশনের ব্যবসা। পাশাপাশি ফোন, ফ্যাক্স এবং সাউন্ড সিষ্টেমের ব্যবসাও শুরু করি। এসব ব্যবসার আয় দিয়ে একটা বাড়ি বানিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য। অভিবাসনকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আমার চাচাকে আমার এই উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য। বর্তমানে আমি পরিবারের সাথে সুখী জীবন যাপন করছি।

আমি 'সোনার মানুষ' খেতাব পেয়েছি

আবদুল হাশেম চৌধুরী

কুমিল্লা জেলার খোশকান্দি গ্রামের বাসিন্দা আমি। লেখাপড়া শেষ করার পর উপলব্ধি করি যে, আমাদের গ্রামের মানুষজন বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদা আলাদা সমাজ গড়ে তুলছে। আমি মনেপ্রাণে তাদের একত্রিত করতে চাইতাম। আজ যারা খোশকান্দির নেতা, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের সামাজিক কাজের জন্য একত্রিত করেছিলাম। গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা খরচ করেছিলাম। ফলে গ্রামবাসী আমার ওপর খুবই খুশি হয় এবং আমাকে আরও দায়িত্ব দেয়। কিন্তু কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম যে সমাজেসেবা করলে আমার জীবন চলবে না। আমাকে অবশ্যই আয়-উপার্জন করতে হবে। কিছুদিন বিষয়টা নিয়ে চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত নেই বিদেশ যাওয়ার। ১৯৯৩ সালে লিবিয়ায় অভিবাসী হই। সেখানে ওয়েল্ডার হিসেবে কাজ শুরু করি।

ছয় বছর পর গ্রামে ফিরে আসি এবং মাছচাষের উদ্যোগ নেই। পাঁচশ ডেসিমেলের বেশি জমিতে কয়েকজন গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে মিলিতভাবে 'খোশকান্দি ফিশারিজ লিমিটেড' নামে একটা মাছচাষ প্রকল্প শুরু করি। এলাকার লোকেরা আমার দক্ষতায় খুশি হয়ে আমাকে প্রকল্পের র্নিবাহী পরিচালক নির্বাচিত করে। আমিও আমার দক্ষতার সাহায্যে প্রকল্পের উন্নয়নের চেষ্টা চালাই।

দুই বছর প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের পর আমি আবার কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং এবার যাই সৌদি আরবে। সেখানে একটা দোকানে সেলসম্যান হিসেবে কাজ শুরু করি। নয় বছর পর দেশে ফিরে আসি। এই ফিরে আসার মধ্য দিয়ে আমার অভিবাসী জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আমি আবার মাছ চাষের সাথে যুক্ত হই। এলাকার মানুষ আবার আমাকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্বাচিত করে। মাছ চাষের পাশাপাশি অন্য কিছু ব্যবসাও শুরু করি। মাছের প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছি। কিন্তু আমি আরও বহুদূর যেতে চাই। মাছ চাষের জন্য প্রচুর খাবার কিনতে হয়। যদি মাছের খাবার তৈরির একটা কারখানা থাকত তাহলে তা খুবই লাভজনক হতো। এই চিন্তা থেকে অন্য কিছু মানুষকে সাথে নিয়ে একটা মাছের খাবার তৈরির কারখানা করেছি। বর্তমানে আমি এই কারখানার প্রধান ব্যক্তি। এমআরপিসি কমিটির চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুসারে প্রতিষ্ঠা করেছি একটা

মশলার কারখানা। অন্তত ২৫ জন মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। রামরু আমাকে ২০১১ সালে বাংলাদেশের "সোনার মানুষ" হিসেবে সম্মানিত করেছে।

বাবার মরা মুখটা দেখতে পেলাম

পাপিয়া আক্তার

আমি পাপিয়া আক্তার। বাড়ি টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার তেজপুর গ্রামে। আমার বাবা ২০১৩ সালে সৌদি আরব যান কাজের জন্য। পরিবারেরটাকে ভালো রাখতে। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয় জন। এক বছর ছয় মাস বাবা সেখানে কাজ করেছিলেন। এ সময় পরিবারে যাবতীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কিছু ঋণও শোধ করেছিলেন।

সৌদি আরবে থাকাকালীন আমার বাবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। এ খবর পরিবারকে বিপর্যস্ত করে তুলে। তখন আমার পরিবার বাবার মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার জন্য নাগবাড়ি অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি-র সাহায্য চায়। বাবা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে নাগবাড়ি এমআরপিসি জেলা কর্মসংস্থান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। লাশ ফিরিয়ে আনার জন্য লিখিত আবেদনও জানায়। তিন মাস কেটে যায়। কিন্তু বাবার লাশ ফিরিয়ে আনা যাবে কিনা সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা 'আরপিডিও'-র সহায়তায় আমরা জানতে পারি যে বিএমইটি-তে আমাদের আবেদনপত্র গৃহীত হয়নি। আরপিডিও আবার নতুন করে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে রামরু'র মাধ্যমে বিএমইটি-র সাথে যোগাযোগ করে।

এইবার বিএমইটি কার্যালয়ে আবেদনপত্র যথাযথভাবে জমা দেওয়ার পর আমার বাবার মৃতদেহ বাংলাদেশে ফেরত এসেছিল এবং এক মাসের ভেতরে আমরা তার দাফনের কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। এমআরপিসি-র কাছে আমাদের পরিবার খুবই কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে জনাব কামাল, জসিম ও লতিফ ভূঁইয়ার কাছে। বিভিন্ন সমস্যা অতিক্রম করে আমার বাবার মৃতদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা কোনোদিন ভুলবার নয়। তারা না থাকলে কাজটা সহজে সম্ভব হত না।

ছেলের লাশটাও পোড়াতে পারি নাই

ধীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর

আমি ধীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। আট বছর আগে আমার ছেলে দুলাল সৌদি আরবে গিয়েছিল। দালাল জানিয়েছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যে আবেদনকারীরা মুসলিম হলে চাকরি পাওয়া সহজ হয়। সে অনুসারে আমার ছেলের পাসপোর্ট তৈরি হয়েছিল মুসলমান নামে। দুলাল সৌদি আরবে কাজ শুরু করেছিল ড্রাইভার হিসেবে এবং তার কাজকর্ম ভালোই চলছিল। দুলালের স্ত্রী ও দুই মেয়ে এবং এক ছেলেসহ আমাদের মোট সাত জনের সংসার ভালোই চলছিল।

পাঁচ বছর সৌদি আরবে কাজ করার পর দুলাল ওখানে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেই করুণ কাহিনীর বর্ণনা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। এ সময় অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি

আমাদের পরিবারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা দুলালের মৃতদেহ দেশে আনার পাশাপাশি আমাদের পরিবারের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি জানিয়ে আবেদন করে। কিন্তু অনেকটা সময় পার হওয়ার পরও কোনো কাজ হচ্ছিল না। আমি এমআরপিসি-র সদস্যদের সাথে আলোচনা করি কেন আমাদের দাবি গ্রহন করা হচ্ছে না। আমি তাদেরকে আরও জানাই যে, আমার ছেলে সৌদি আরবে মুসলমানের নাম ও পরিচয়ে কাজ করছিল। এমনকি তার পাসপোর্টেও সে একই নাম ব্যবহার করেছিল এবং আমরা দেখতে পেলাম সেটাই ছিল প্রধান বাধা আমাদের দাবি প্রক্রিয়াকরণের। আমার ছেলের পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রমাণপত্রে পার্থক্য থাকায় মৃতদেহ এবং ক্ষতিপূরণ দাবির আবেদনপত্র সম্পর্কে কোন কথা বলা হচ্ছিল না। এ অবস্থায় স্থানীয় এনজিও আরপিডিও ও রামরু যৌথভাবে বিএমইটি-র কর্মকর্তাদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, নিতান্তই অভাবের কারণে ও সৌদিতে চাকরির সুবিধা পেতে সে মুসলমান পরিচয় দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিএমইটি আমাদের পরিবারকে এক লাখ ৯৬ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। তবে ছেলের লাশ আর ফেরত পাইনি। এমআরপিসি, আরপিডিও এবং রামরু সহযোগিতা না করলে এ ক্ষতিপূরণটাও পেতাম না। দুর্ভাগ্য আমার যে, ছেলের আত্মা পরিশুদ্ধ করতে পারলাম না।

ব্যর্থ অভিবাসী কিন্তু স্বার্থক উদ্যোক্তা

মোহাম্মদ জিল্লুর আবেদীন

আমার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার ছিলিমপুর ইউনিয়নে। ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালের আগষ্ট মাসে সৌদি আরব গিয়েছিলাম কাজ করতে। কিছুদিন সেখানে কাজ করার পরে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার কোম্পানি আমাকে জোর করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এভাবে দেশে ফেরত আসার কারণে বহুদিন পর্যন্ত আমার ঋণ করে জোগাড় করা অভিবাসনের খরচ শোধ করতে পারিনি। একটা লম্বা সময় ধরে আমি বাড়িতে ঘুমাতে পর্যন্ত পারতাম না, দিনে ও রাতে পাওনাদাররা আমাকে তাড়া করে ফিরতো। তাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সময় আত্মীয়ের বাসায় পালিয়ে থাকতাম।

এমন একটা সময় আমি ছিলিমপুর অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি আয়োজিত এক সভায় অংশগ্রহণ করি। এমআরপিসি-র এক সদস্য আমার বর্তমান অবস্থা জেনে কীভাবে তা মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেয়। আমার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে। তাই তার পরামর্শ অনুসারে গবাদিপশু বেচাকেনার একটা ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করলাম। আমার উদ্যোগকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ছিলিমপুর এমআরপিসি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে পুনর্বাসন ঋণ নেওয়ার জন্য আমাকে আবেদন করতে সাহায্য করে।

এমআরপিসি-র সহযোগিতার কারণে আবেদনের তিন মাসের মধ্যে আমি এক লাখ টাকা ঋণ পাই। যখন এই ঋণ নেই তখনও জানতাম না এই ঋণ কিভাবে আমার জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে। বেশ কয়েক বছর হলো আমি গরু কেনাবেচার ব্যবসা করছি এবং এতে

আমার ভালোই লাভ হচ্ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আজ আমি তৃপ্ত, আমার স্বপ্ন আজ বাস্তব

মোহাম্মদ কায়সার আলম

আমি কায়সার আলম। টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার বানকিনা গ্রামে আমার বাড়ি। বাবা, মা, দুই ভাই ও আমার স্ত্রী, এই হলো আমাদের সংসার। কিছু কৃষিজমি ছিল, কিন্তু তাতে সংসার চলতো না। আমি একটা ছোট দোকানে কাজ করতাম এবং আয় ছিল খুবই অল্প। আমাদের পরিবার ছিল খুবই গরিব সে কারণে একটু স্বচ্ছলতার আশায় অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

মাত্র ২১ বছর বয়সে ২০০৭ সালে আমি সৌদি আরবে অভিবাসী হয়েছিলাম। খরচ হয়েছিল তিন লাখ টাকা। অর্ধেক টাকা জোগাড় করেছিলাম চড়া সুদে। বাকিটাও ঋণ করেছিলাম, তবে সুদহীন। সৌদিতে একটা গেষ্টহাউসে ক্লিনারের চাকরি পেলাম। বেতন মাসে চারশ সৌদি রিয়াল। বাংলাদেশের হিসাবে প্রায় ১০ হাজার টাকা। বেতনের বেশির ভাগই খরচ হয়ে যেত থাকা-খাওয়ায়। চাকরির প্রথম ছয় মাসে দেশে কোনো টাকা পাঠাতে পারিনি। তখন কিছু বাড়তি আয়ের আশায় ক্লিনারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওখানকার বিভিন্ন বাড়িতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ শুরু করি। ফলে প্রতি মাসে ২০ থেকে ২৫ হাজার বাংলাদেশী টাকা আয় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেশে টাকা পাঠাতে থাকি এবং এক বছরের মধ্যে আমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। গ্রামে আমি কিছু জমিও কিনেছি, কিছু জমি লিজ নিয়েছি। পুরানো বাড়িটা সংস্কার করেছি। আগে ঘরের মেঝে ছিল মাটির, এখন সেখানে টাইলস্ বসিয়েছি এবং ঘরের ছাদ দিয়েছি টিন দিয়ে। তিন বছর পর ৪০ দিনের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিলাম। গ্রামে যেমন জমি কিনেছি তেমনি কাছাকাছি শহরেও কিনেছি কিছু জমি। ছুটি শেষে সৌদিতে ফিরে আগের মতোই কাজ শুরু করি এবং একই সাথে বিভিন্ন বাড়িতে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে থাকি। অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় বার ওখানে আড়াই বছর থাকার পর দেশে ফিরি। একটা লাইসেন্স করে বর্তমানে রেজিষ্ট্রি অফিসে দলিল লেখকের কাজ করছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাকি জীবন দেশে থাকার। জমানো টাকা ব্যংকে রাখা আছে। আমার দুটি মেয়ে। বড় মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে এবং ছোটটির বয়স দেড় বছর। আমার স্ত্রী একজন গৃহবধূ এবং সে আমার বৃদ্ধ বাবা-মার পরিচর্যা করে। আমি এখন সুখী। কারণ আমার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পেরেছি।

চার বছর কাজ করেছি কিন্তু বেতন পেয়েছি এক বছরের

ফরিদা

আমার নাম ফরিদা। টাঙ্গাইল জেলার বরুহা গ্রামে আমার বসবাস। আমি সাতাশ বছর বয়সী একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। বিয়ের কয়েক বছরের ভেতরেই স্বামী আমাকে তালাক দেয়। তারপর সন্তানদের নিয়ে বাবার পরিবারে ফিরে

এসেছিলাম। কিন্তু, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর ভাইয়ের পরিবারে থাকা আর সম্ভব হলো না। তখন আমি আলাদা বাড়িতে চলে আসি কিন্তু সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খেতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম অভিবাসনের এবং ২০০৭ সালে সৌদি আরবে গেলাম এক লাখ ১০ হাজার টাকা খরচ করে। এ টাকা যোগাড় করতে আমাকে গহনা বিক্রি করতে হয়েছিল যা আমি আমার মেয়ের জন্য কিনেছিলাম। দালাল আমাকে বলেছিল যে ক্লিনারের কাজ পাবো এয়ারপোর্টে অথবা হোটেলে কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর আমাকে দেওয়া হলো গৃহকর্মীর কাজ। যে বাড়িতে কাজ পেলাম সেখানে সদস্য সংখ্যা দশ জন। তাদের সময়সূচির সাথে মানিয়ে চলা আমার জন্য কঠিন হয়ে উঠলো। কারণ এরা সবাই দিনের বেলা ঘুমায় এবং রাতে জেগে থাকে। বলতে গেলে তারা প্রায় ২৪ ঘন্টাই আমাকে বাধ্য করতো কাজ করতে। কোনো বিশ্রামের সময়ই ছিল না। তবে খাবার, জামাকাপড় এসবের কোনো কষ্ট ছিল না। আমার বেতন ছিল প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা এবং এক বছর নিয়মিত তা পেয়েছি। কিন্তু বছর শেষে যখন বাড়ি আসতে চাই তখন চাকরিদাতা আমার বেতন বন্ধ করে দেয়। তারপর আরও তিন বছর আমি বেতন ছাড়াই কাজ করেছি। বকেয়া বেতন চাইলেই গৃহকর্তা বলতো সব বেতন পরবর্তীতে একসঙ্গে দেওয়া হবে। আমি ভাবতাম বেতনের সব অর্থ কাজ শেষে যাওয়ার সময় একসঙ্গে পাওয়া যাবে, কিন্তু আমাকে মিথ্যা বলা হয়েছিল। আমি কখনই ওই তিন বছরের বেতন পাই নাই। কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি দেশে চলে এলাম। বর্তমানে আমার কোনো কাজ নাই। যে গহনাগুলি বিক্রি করেছিলাম সেগুলোও আর কিনতে পারিনি। তবে আরও একবার বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই। কিন্তু গৃহকর্মী হিসেবে কোথাও যেতে চাই না। বরং ক্লিনার হিসেবে কাজ করতে যাবো। না হলে যাবো না।

যাই ধরেছি, সোনা হয়ে গিয়েছে

মনিরুল হোসেন

আমি টাঙ্গাইল জেলার বরুহা গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। আমাদের সংসার অনেক বড় - ছয় ভাই, দুই বোন, বাবা-মা, চার ভাইপো, তিন ভাইজি এবং আরও অনেকে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ জনের পরিবার। এইচএসি পাশ করার পর নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসা শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেই ব্যবসায়ে খুব একটা লাভবান হই নাই। আমার বড় ভাইও ব্যবসা করত। সেও ব্যবসা থেকে তেমন লাভবান হতে পারে নাই। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আমি অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম অন্য কোথাও গেলে ভালো আয়ের ব্যবস্থা হবে। তবে আমার সিদ্ধান্তের কথা কাউকে জানাই নি।

আমি ১৯৯১ সালে ১৮ বছর বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলাম। খরচ হয়েছিল ৫৫ হাজার টাকা। দালালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি সেখানে টেকনিশিয়ানের চাকরি পেয়েছিলাম। আমার বেতন ছিল মাসে ১৫ হাজার টাকা। সেখানে দুই বছর কাজ করার পর দেশে ফিরে আসি। তারপর ১৯৯৫ সালে সিঙ্গাপুরে যাই একটা ক্লাবে রিসিপশনিস্ট এর চাকরি নিয়ে। সেখানে বেতন ছিল মাসে ৪০ হাজার টাকা। পাশাপশি কিছু পার্ট টাইম চাকরিও করেছি। প্রতি

মাসে আমার খরচ ছিল ২০ হাজার টাকা। সুতরাং মোটা অঙ্কের অর্থ দেশে পাঠাতাম এবং তা ব্যাংকে সঞ্চয় করা হতো।

তারপর কয়েক বছরের জন্য আমি দেশে ফিরে আসি এবং বিয়ে করি। ২০০৬ সালে মাসিক ৩৫ হাজার টাকা বেতনে দুবাই যাই নির্মাণ খাতে কাজ করার জন্য। সেখানে দু'বছর কাজ করে ২০০৮ সালে দেশে ফিরে আসি। আমার স্ত্রী ও তিন কন্যা সন্তান গ্রামে বসবাস করে। বড় মেয়েটি লেখাপড়া করছে ষষ্ঠ শ্রেণিতে, মেঝোটা তৃতীয় শ্রেণিতে এবং ছোট মেয়েটার বয়স মাত্র চার বছর। কিছু অর্থ খরচ করে গ্রামের বাড়িটার সংস্কার করেছি। বর্তমানে আমার কোনো চাকরি নাই। তাই আরও একবার বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবছি। এবার তাইওয়ান যেতে চাই। আশা করছি ২০১৬ সালের শেষ দিকে সুযোগটা নেব। অভিবাসনের কোনো পর্যায়েই আমি প্রতারিত হই নি। আমার অভিবাসনের খরচও ছিল অন্য অনেকের তুলনায় কম। সব দেশেই প্রত্যাশিত চাকরি পেয়েছিলাম। এসব কারণ-ই আমাকে বারবার বিদেশে কাজ খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সব চাকরিদাতাই কিন্তু খারাপ না

মরিয়ম বেগম

আমার বাড়ি ঢাকার কেরানীগঞ্জে। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। আমি কাজ করি সৌদি আরবে। অল্প কিছুদিন হলো আমি ছুটিতে দেশে এসেছি। বিশ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখেই ছিলাম। কিন্তু বিয়ের বারো বছর পর হঠাৎ করেই আমার স্বামী মারা যায়। ফলে ভয়াবহ সমস্যায় পড়ে যাই। আমার ব্যক্তিগত কোনো রোজগার ছিল না। স্বামীও আমাদের জন্য কোনো সঞ্চয়ও রেখে যায় নাই। কোনো উপায় না থাকায় আমি বাবার বাড়িতে ফিরে আসি। বাবা একজন অসুস্থ মানুষ এবং পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। তার চিকিৎসা চলছে। নিয়মিত তাকে ওষুধ খেতে হয় এবং এই ওষুধের জন্য খরচও হয় অনেক টাকা। ফলে আমার ও আমার দুই সন্তানের ভরণপোষণ তার জন্য বোঝা হয়ে যায়। এ সময় আমার মা আমাকে বিদেশ যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমি সৌদি আরবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সেখানে গৃহকর্মীর চাকরি নিয়ে যেতে খরচ হয় ৬০ হাজার টাকা। চাকরিদাতা ভিসা ও টিকিটের ব্যবস্থা করে। বেতন প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা। সেই সাথে দুই ঈদে ৪০ হাজার টাকা বোনাস পাই। কাজের চাপে চাকরিদাতার বাড়ি ছেড়ে কোথাও বাইরে যেতে পারি না। তবে খাওয়া পরার কোনো কষ্ট নাই এবং অসুস্থ হলে তারা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। বেতন নিয়মিত পাই এবং দেশে টাকা পাঠাই। আমার ছেলেমেয়েরা আমার মায়ের কাছে আছে এবং সম্প্রতি লেখাপড়া করতে শুরু করেছে। আমার পাঠানো টাকা দিয়ে মা তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করছে। আমি যাদের বাড়িতে কাজ করি তারা খুব ভালো। পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং সন্তানদের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ করিয়ে দেয়। আমার পাঠানো টাকা পরিবারের যাবতীয় চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। এবার এসে নিজের নামে একটি একাউন্ট খুলেছি, উপার্জনের একটা অংশ ব্যাংকে সঞ্চয় করবো বলে।

দেশে সতীনের সঙ্গে বসবাসের চেয়ে বিদেশে অসুস্থ থাকাও উত্তম

সালমা বেগম

আমার নাম সালমা বেগম। আমি ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা এবং একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। কাজের চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই অসুস্থতার কারণে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। দেশে আমার স্বামী রিক্সা চালাত কিন্তু আমাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তার আয় যথেষ্ট ছিল না। আমি বসবাস করতাম স্বামী, তার বাবা-মা, স্বামীর আরেক স্ত্রী ও তার সন্তানের সাথে। ফলে খাওয়া, বাড়িভাড়া এবং লেখাপড়া এসব নিয়ে পরিবারে সবসময়ই বিভিন্ন সমস্যা লেগে থাকত।

নানাদিক বিবেচনা করে বিদেশে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে ২০১৫ সালে ২০ হাজার টাকা খরচ করে সৌদি আরব যাই। ছয় সদস্যের এক পরিবারে আমি কাজ করতে শুরু করি। প্রবল উৎসাহে কাজ করতে শুরু করেছিলাম কিন্তু ভাগ্য আমার সহায় ছিল না। নানা রকমের সমস্যা হতো। পাশাপাশি আমাকে থাকা ও খাওয়ার কষ্টও দেওয়া হতো। এমনকি কোনো বিশ্রামও নিতে দেওয়া হতো না। ফলে দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার গৃহকর্ত্রী ভাবলো আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অসুস্থতার ভান করছি। আবার আমাকে তারা ডাক্তারের কাছেও নেয় না। দিন দিন আমার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তারপরও আমাকে প্রাত্যহিক কাজ চালিয়ে যেতে হয়। তখন মনে মনে ভাবি দেশে ফিরে স্বামী ও সতীনের সঙ্গে সংসার করার চেয়ে সেখানে থাকাই ভালো। শারীরিক অবস্থা যখন আরও খারাপ হয় তখন ওরা আমাকে রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসে পাঠিয়ে দেয়। এজেন্সির কর্মকর্তারাও বিশ্বাস করে না যে আমি অসুস্থ। তারা আমাকে খাবার দেয় না। উল্টো মারধোর করে। আমি বাধ্য হয়ে সেখানে ১৫ দিন থাকি। পনেরো দিন পর আমার গৃহকর্ত্রী আমাকে দেখতে আসে। আমার শারীরিক অবস্থা তখন আরো খারাপ। তখন সে বিষয়টি উপলব্ধি করে। সে আমার সব বকেয়া বেতন দিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে অতিরিক্ত চার হাজার টাকা দেয়। এজেন্সির কর্মকর্তাদের বলে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে। কর্মকর্তারা আমার ফেরার ব্যবস্থা করে। তারা টিকিট কেনে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। এসব করার কারণে তারা আমার বেতন থেকে একটা বড় অংশ কেটে রাখে। শেষ পর্যন্ত ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে দেশে পাঠিয়ে দেয়। এখনও আমি অসুস্থ এবং কোনো কাজ করতে পারি না। আমার চিকিৎসা চলছে।

কোম্পানি ভিসায় বিদেশ যাবার ফলাফলই ভিন্ন

মোহাম্মদ ইয়াকুব

আমি মুন্সীগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আমার বয়স ৪৯ বৎসর। বিদেশ যাওয়ার আগে আমাদের কোনো জমিজমা ছিল না। পরিবারে সদস্য সংখ্যা ছয় জন, বাবা-মা, দুই ভাই এবং এক বোন। ভাইয়েরা অন্যের জমিতে কাজ করতো। সংসার চলতো না। বোনের বিয়ে দেওয়ার সময় মোটা অঙ্কের টাকা ধার করতে হয়েছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করতে এবং পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে আমি বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ২০০১ সালে ৩৫ বছর বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলাম দুই লাখ টাকা খরচ করে।

আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। বলতে গেলে, সত্যিই আমরা ছিলাম গরিব। ফলে, অভিবাসনের খরচও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার করে জোগাড় করা হয়েছিল। সৌদি আরবে গিয়ে গাছ পরিচর্যাকারীর একটা কাজ যোগাড় করতে পেরেছিলাম। বেতন মাসে ৭০০ সৌদি রিয়াল। আমার জীবনযাপনের যাবতীয় খরচ বহন করেছিল আমার কোম্পানি। ফলে আমার বেতনের প্রায় পুরোটাই সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। সঞ্চিত অর্থ সব সময়ই দেশে পাঠাতাম। সাত বছর পর আমার বেতন বেড়ে ১৫০০ সৌদি রিয়ালে দাঁড়ায়। আমার পাঠানো অর্থে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছিল।

ছুটিতে বাড়ি আসার পর বিয়ে করেছি। পুরান বাড়ি সংস্কার করেছি এবং কিছু জমি কিনেছি। সৌদি আরবে যাওয়ার ভিসার মেয়াদ এখনও আছে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে যাব এবং ভিসার মেয়াদ থাকা পর্যন্ত কাজ করবো।

আমি চাকরির জন্য বিদেশে এসেছি, শোওয়ার জন্য না

তামান্না বেগম

আমি নওগাঁ জেলার রানীনগর উপজেলার পূর্বগড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। বিদেশ যাওয়ার আগে আমার পরিবার ছিল খুবই গরিব। স্বামী ছিল একজন রিক্সাচালক। তার উপার্জনে পুরো পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না। কোনো কৃষিজমি ছিল না আমাদের। একটাই ছেলে আমাদের এবং সে লেখাপড়া করছে। আশা করছি লেখাপড়া শিখে একদিন সে ভালো মানুষ হয়ে উঠবে। তবে এ জন্য চাই ভালো রোজগার।

এসব কারণে আমি অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ২০১৬ সালে গৃহকর্মীর চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম সৌদি আরব। তখন আমার বয়স ২৬ বছর। অভিবাসনের জন্য আমার খরচ হয়েছিল এক লাখ ২৫ হাজার টাকা। তাছাড়া বিদেশ যাওয়ার আগে দালালকে কয়েক দফায় ৭০ হাজার টাকা দিয়েছি। ট্রেনিং এর জন্য ঢাকায় এলে সে আরও টাকা দাবি করে। তখন আমার কাছে কোনো টাকা না থাকায় কানের দুল বিক্রি করেছিলাম।

সৌদি আরবে যে বাড়িতে আমি কাজ শুরু করেছিলাম সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৪ জন। প্রথম কয়েকদিন বেশ ভালোই কাটে। কিন্তু তারপর তারা আমাকে উৎপীড়ন করতে শুরু করে। পরিবারের কয়েকজন বয়স্ক সদস্য জোরপূর্বক আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি রাজি হই নাই। ফলে তারা বিভিন্নভাবে আমার ওপর নির্যাতন চালাতে শুরু করে। "আরে বাবা, আমি কাজের জন্য বিদেশে এসেছি, ইজ্জত খোয়াতে না"। অবস্থা বেগতিক দেখে ১৫ দিন পর আমি পালিয়ে যাই। আমার সমস্ত জিনিসপত্র সেই বাড়িতে ফেলে যাই শুধু স্মার্ট কার্ডটা নিয়ে যাই। পরদিন চাকরিদাতা আমার নামে মামলা করে। সে দাবি করে আমি তার বাড়ি থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ও গহনা চুরি করেছি। কিন্তু এটি ছিল মিথ্যা অভিযোগ এবং পুলিশকে আমি তা জানিয়েছিলাম। পুলিশ তল্লাশী করে কিছুই পায় না একমাত্র স্মার্ট কার্ড ছাড়া। তারপর আমাকে অন্য একটা বাড়িতে কাজ করতে পাঠানো হয়। এই বাড়ির

গৃহকর্তার নির্যাতনের প্রবণতা ছিল না কিন্তু সে আমার পাসপোর্ট জব্দ করে। আমি পাসপোর্ট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছি কয়েকবার কিন্তু সফল হই নাই। সাত দিন পর এই বাড়ি থেকেও পালাই এবং দূতাবাসের সহায়তায় দেশে ফিরে আসি। বর্তমানে বাংলাদেশে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি। আমার স্বামীও একই কাজ করে। দুজনের আয়ে ভালো চলছে। কাজের উদেশ্যে আমি আর কখনও বিদেশ যাব না।

অভিবাসনের আরেক নাম - প্রতারণা ও নির্যাতন

রত্না বেগম

আমি রত্না বেগম। নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা এবং ৩০ বছর বয়সী একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। বিদেশ যাওয়ার আগে একটা মেসে রান্নার কাজ করতাম। আমার একটাই ছেলে। বিয়ের সময় স্বামী বলেছিল সে আমার যাবতীয় খরচ জোগাবে ও একটা বাড়ি বানিয়ে দিবে। কিন্তু বিয়ের পর সে প্রতি মাসে আমাকে দুই হাজার টাকা দিতো যেখানে আমার বাড়ি ভাড়াই প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকা। ছেলেকে নিয়ে আমার দুই বোনের সঙ্গে বসবাস করতাম। স্বামী থাকত অন্য জায়গায়। এ রকম অবস্থার কারণে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হতো। আমি স্বপ্ন দেখতাম যেভাবেই হোক ছেলেকে লেখাপড়া শেষ করাবো। নিজে কখনই লেখাপড়ার সুযোগ পাই নাই। অল্প বয়সে আমার মা মারা যাওয়ার কারণে আমার ছেলেবেলাটা খুব কষ্টে কেটেছে।

এসব কারণে আমি অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সৌদি আরবে গিয়েছিলাম দালালের মাধ্যমে। দালালকে দিয়েছিলাম ৭০ হাজার টাকা। এই টাকা আমি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করেছিলাম মাসে ২০ হাজার টাকা সুদ দেয়ার শর্তে। দালাল আমাকে বলেছিল সৌদি আরবে গৃহকর্মীর কাজে আমি বেতন পাব প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা। সেখানে আমাকে কাজের জন্য একেক দিন একেক বাসায় নিয়োগ করা হয়। প্রথম মাসে অনেকগুলি পরিবারে কাজ করতে হলো। কখনও কোথাও কাজ করেছি একদিনের জন্য, কখনও কয়েকদিনের জন্য। সবগুলি বাড়িতেই খাবারের সমস্যার মুখোমুখি হতে থাকি এবং মাস শেষে কোনো বেতন পাই নাই। কোনো কোনো পরিবারে শারীরিক নির্যাতনও করা হয়। বেতন চাইলে এক বাড়িতে আমাকে পানির বোতল ছুড়ে মারা হয়। অন্য এক বাড়িতে পুরুষ সদস্যরা জোরপূর্বক আমার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। রাজি হইনি বলে মারধোর করে। তখন আমার স্বামীকে এসব কথা জানালে সে দালালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অবস্থা বেগতিক দেখে দালাল আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনে। এসব করতে আমার স্বামীর ৪৫ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। মোট আট মাস সৌদি আরবে বহু পরিবারে কাজ করেছিলাম, কিন্তু বেতন পেয়েছি মাত্র তিন মাসের। সেটাও দালালের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ২০ হাজার টাকা নয়। আমি পেয়েছি মাত্র ১৬ হাজার টাকা করে। দেশে ফিরে আবারও আমি মেসে কাজ করতে শুরু করেছি। স্বামী নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছে। আমার ছেলের বয়স মাত্র দশ বছর। সে চতুর্থ শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। বিদেশ যাওয়ার আগে এবং বিদেশ যাওয়ার সময় আমি যে ঋণ করেছিলাম তা এখনও পরিশোধ করতে পারি নি। কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি যেমন করেই হোক ঋণ শোধ করে এই দেশে টিকে থাকার।

বাবার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করিনি, এটাই আমার সান্তনা

আব্দুল কাজেম

আমি আব্দুল কাজেম দোহার উপজেলার বাসিন্দা। আমার বাবা ৭০ হাজার টাকা খরচ করে ১৯৯২ সালে আমাকে সৌদি আরব পাঠিয়েছিল। আমার পরিবার ভেবেছিল, যদি কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাই তাহলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আমরা অর্থ সঞ্চয় শুরু করতে পারব। বিদেশ যাওয়ার আগে আমি দোকানদারি করতাম। মাসে আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা আয় হতো। পরিবারের ক্রমবর্ধমান ব্যায় মেটানোর জন্য এই রোজগার যথেষ্ট ছিল না এবং আমাদের পরিবারে আর্থিক সমস্যা লেগেই থাকত। আমাদের কিছু প্রতিবেশি বিদেশে থাকতো। তাদের অবস্থা ভালো ছিল। তাদের স্বচ্ছলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার বাবা আমাকে বিদেশে পাঠায়।

সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর কোনকিছুই আমার জন্য সহজ হয় নাই। শুরুতে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। প্রথম দিকে বিদেশে আমার জীবন ছিল খুবই জটিল। এসব জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শেখা এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমার অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করল।

সৌদি আরবে থাকাকালীন অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে আমি আয় করেছি মাসে ৭০ হাজার টাকা এবং পরিবারকে ভালোভাবেই সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি। আমি বিদেশে থাকাকালীন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি এবং আমার ভাই বাবার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করিনি। যা টাকা দরকার ছিল সবই পাঠিয়েছি। আমাদের দূর্ভাগ্য যে আমরা বাবাকে বাঁচাতে পারিনি। তখন বাড়ি ছেড়ে দূরে থাকাটা আমার জন্য ছিল খুবই বেদনার। কিন্তু জানতাম আমার উপার্জন পরিবারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার উপার্জন এবং কাজের অভিজ্ঞতা আমার ভাইকে উৎসাহিত করে বিদেশ আসার। তাকেও সৌদি আরবে নিয়ে আসি। চার বছর একসাথে সৌদি আরবে কাজ করার পর দুই ভাই অল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে ফিরে আসি। উদ্দেশ্য বিয়ে করা। কিছুদিন পর আমরা আবার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সৌদি আরবে ফিরে যাই।

স্ত্রী বাংলাদেশে রেখে সৌদি যাওয়া ছিল আমাদের দুই ভাইয়ের জন্য খুবই কষ্টের। আমার সন্তানকে দেশে রেখে সৌদি আরবে বসবাস করাটা ছিল অবশ্যই একটার বেদনার বিষয়। তবে ২০০৪ সালে আমার উপার্জনে আমার স্ত্রী নয় লাখ টাকা দিয়ে ৮৬৪ স্কয়্যার ফুটের একটা বাড়ি কেনে। আমরা কিছু কৃষিজমিও কিনেছি এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেছি মোটা অঙ্কের টাকা। আমার সন্তানের লেখাপড়া আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এটাও জানি জীবনে সাফল্য পাওয়াও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার সঞ্চয়কে নিশ্চিত করতে চাই সন্তানের লেখাপড়ার জন্য।

আমার কাহিনী হলো সাফল্য ও সমৃদ্ধির। আমি জানি, আমি ভাগ্যবান কারণ, আমি ভাল সময়ে বিদেশে গিয়েছিলাম। আমাদের এলাকা থেকে যে সব বাংলাদেশী ২০০৫ সালের পর বিদেশে

গিয়েছে তাদের বেশীরভাগ সেখানে গিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি।

দক্ষতা দিয়েছে সাফল্য, বাড়িয়েছে উপার্জন

আব্দুল কাদের

আমার নাম আব্দুল কাদের। দোহার জেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ গ্রামের বাসিন্দা আমি। আমার বাবা ১৯৯৪ সালে মারা যান এবং তার মৃত্যুই আমাকে পরবর্তীতে প্রভাবিত করে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে। আমি ১৯৯৯ সালে সৌদি আরব গিয়েছিলাম। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমি বেকার ছিলাম। সৌদিতে থাকা আমার ভাই তখন আমাদের পরিবারের দায়িত্ব নেয়। আমি বাড়িঘর দেখাশুনা করতাম। বাবা মাত্র সাত ডেসিমেল কৃষিজমি রেখে গিয়েছিলেন, যা দিয়ে সংসার চলার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া গ্রামে তখন কোনো কাজকর্ম ছিল না। এ সময় আমার বড় ভাই আমাকে সৌদি আরব নিয়ে যায় তার সাথে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য।

সৌদি আরবে বসবাসকারী এক বাংলাদেশী দালালের কাছ থেকে আমার ভাই ইলেকট্রিশিয়ানের কাজের একটা ভিসা কিনেছিল। দালাল ভিসাটা জোগাড় করেছিল একজন সৌদি নাগরিকের কাছ থেকে। এই ভিসার জন্য খরচ হয়েছিল আড়াই লাখ টাকা। পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং একজন মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এই টাকা জোগাড় করেছিলাম। আমি চৌদ্দ বছর ধরে বিদেশে বসবাস করছি এবং নিজেকে একজন দক্ষ কর্মী বলে মনে করি। কাজের শুরুতে, আমার বেতন ছিল প্রতিমাসে ১২ হাজার টাকা। বর্তমানে বেতন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার টাকা। দক্ষ কর্মী হিসেবে বেশি বেতন পাচ্ছি এবং বেশি টাকা দেশে পাঠাচ্ছি।

২০১০ সালে খুব অল্প সময়ের জন্য একবার দেশে এসেছিলাম। তখন বিয়ে করি এবং সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করে বাড়ি বানাই। বর্তমানে আমার স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে দোহারে থাকে। আমি এক মাসের ছুটিতে দেশে এসেছি। সৌদি আরব থাকলে সংসারের যাবতীয় বিষয়ে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেই। পরিবারের সবকিছু যেন স্বচ্ছন্দে চলে এজন্য বছরে কমপক্ষে এক লাখ টাকা পাঠাই।

বর্তমানে আমার ব্যাংকে চার লাখ টাকা সঞ্চয় হয়েছে এবং প্রতিমাসে আমার স্ত্রীর একাউন্টে জমা করছি ৫০০ টাকা। আমাদের কোনো ঋণ নাই এবং সংসারেও স্বচ্ছলতা ফিরেছে। আমি এবং আমার স্ত্রী সম্প্রতি আমার শ্যালিকাকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। সে এখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী এবং তার স্কুলের বেতন ও গৃহশিক্ষকের খরচ প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা আমি দেই। গত বছর দেশে ফিরে আসার পর স্থানীয় মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে সহায়তার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিয়েছি। কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাবার সময় আর্থিকভাবে স্বাধীন হওয়ার এবং নিজের একটা বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম। আজ আমার দুটো স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয়েছে। ভবিষ্যতে আমি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ফিরে আসব এবং শুরু করব আমার নিজের ব্যবসা।

আমার উসিলায় ১০০ বাংলাদেশী বিদেশে যেতে পেরেছে

মোহাম্মদ জামান

আমার বাড়ি ঢাকার কেরানীগঞ্জে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ১৯৮১ সালে ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে ফার্মেসি কোর্সে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছিলাম। সময়টা ছিল তখন আমাদের পরিবারের জন্য খুবই কঠিন। আমি ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ফার্মাসিস্ট হিসেবে একটা চাকরি পেয়ে যাই। বিএমইটি-র মাধ্যমে আমি এই চাকরিটা খুঁজে পাই। সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানটিই কাজের জন্য বিদেশ থেকে বৈধভাবে ভিসা আনত।

আমি তিন বছরের চুক্তিতে সৌদি আরবে কাজ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার দক্ষতার কারণে তারা আরও তিন বছরের জন্য চুক্তি নবায়ন করে। আমার বিদেশে থাকাটা খুবই সফল হয়েছিল। সেখানে থাকাকালে আমি কমপক্ষে ১০০ জন বাংলাদেশীকে সৌদি আরবে চাকরি পেতে সাহায্য করেছি। এছাড়াও ব্যবস্থা করেছি অভিবাসীদের জন্য থাকা ও চিকিৎসার। এমনকি আমার ছোট ভাই ও বোনদেরকে ইউরোপ অভিবাসী হতে সাহায্য করেছি। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছি একটা রফতানিনির্ভর করোগেটেড প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি। সেখানে প্রায় ৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সামনে আরও ৫০ জন কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা আছে আমাদের। এছাড়াও আমার চারটি বাড়ি, একটা দোকান এবং কিছু আবাদি জমি রয়েছে - যার বর্তমান মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকার মতো। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি এ সম্পদ আরো বাড়াতে চাই এবং আরো বেশি লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাই।

দারিদ্র আমাকে আর পরাজিত করতে পারে না

মোহাম্মদ বেলাল হোসেন

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সঙ্গে আমার আর কোনো আপোষ নেই। অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাছাড়া জীবন সবসময়ই মসৃণভাবে চলে না। এক সময় পরিবারের অবস্থা এমন ছিল যে, খাবারের অভাবে আমরা দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেছিলাম। সন্তানদের দুঃখকষ্ট আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। তখন সবসময়ই ভাবতাম কিভাবে সমস্যাগুলো কমিয়ে আনা যায়। খাবার ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনগুলি না মেটাতে পেরে গভীর বেদনায় ডুবে যেতাম। সবসময় একই সমস্যার সঙ্গে একই যুদ্ধ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর ২০০৪ সালে আমি সৌদি আরবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।

অর্থ উপার্জন করে পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং বিশেষভাবে সন্তানদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে সৌদি আরবে গিয়েছিলাম একটা রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে। যাওয়ার খরচ যোগাড় করেছিলাম কিছু কৃষিজমি বিক্রি করে এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে। বিদেশ যাওয়ার আগে আমি দর্জির কাজ করতাম। সৌভাগ্যক্রমে সৌদি আরবেও দর্জির কাজ পেয়ে গেলাম। বেতন মাসে ৯০০

সৌদি রিয়াল, যা ২৪০ ইউএস ডলার সমমানের। অল্প দিনের ভেতরে আমার চাকরিদাতার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুললাম। সে কাজের প্রতি আমার নিষ্ঠা এবং বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা লক্ষ্য করে খুবই খুশি হলো। আমি প্রতিদিন বারো ঘন্টা কাজ করতাম।

আমি ২০০৯ সালে দেশে ফিরে এলাম। বিদেশ থাকার সময় আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো এবং পরিবার ছাড়া সেখানে থাকাটা ছিল প্রকৃতই একটা কঠিন কাজ। প্রায়ই বাড়ির জন্য মন খারাপ হতো এবং স্ত্রীকে পাশে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতাম। কষ্ট পেতাম সন্তানেরা কাছে নেই বলে। দেশে ফিরে আসার পর আমি টেইলরিং ব্যবসা শুরু করলাম। আমার দোকানে বর্তমানে ছয়জন লোক চাকরি করছে। আমার স্বপ্ন ব্যবসা বাড়ানো এবং আরও লোককে চাকরি দেওয়া।

মাঝে মাঝে ভাবি যদি বিদেশ না যেতাম তাহলে কী হতো! নিশ্চিতভাবে অভিবাসন আমার জন্য সৌভাগ্য বহন করে এনেছে। যদিও আমি বিশাল কোনো ধনী মানুষ নই, কিন্তু আমাকে অর্থ সমস্যা এবং ক্ষুধা মোকাবিলা করতে হয় না মোটেও। সত্যি বলতে কী, আমি এখন আর্থিকভাবে পুরোপুরি স্বচ্ছল এবং পরিবার নিয়ে কোনো দুঃশ্চিন্তা করতে হয় না। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে একটা বাড়ি বানিয়েছি এবং কিছু কৃষিজমি কিনেছি। আমি চাই আমার সন্তানেরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। এছাড়া আমি বিশ্বাস করি, অভিবাসনের মাধ্যমে গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা সম্ভব। বিশেষ করে বৈধভাবে পাঠানো রেমিটেন্সের মাধ্যমে। পাশাপাশি, আমার মতো লোকেরা, যারা নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যবসা চালু করেছে তারাই হলো বাংলাদেশের স্থানীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বিদেশে কাজ করে দেশে ফিরে আসা কর্মীর সংখ্যা বর্তমানে অনেক, যারা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী কিন্তু তাদের প্রয়োজন প্রচুর তথ্য এবং ঋণ।

অবশেষে আমাদের বাড়ি পাকা হলো

নাসিমা খাতুন

আমার নাম নাসিমা খাতুন। আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জের খুবই প্রত্যন্ত একটি গ্রাম ইসলামপুরের বাসিন্দা। এই জেলার বহু লোক নির্মাণশ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছে যেমন বাংলাদেশে তেমনি বিদেশে।

আমার স্বামী হাফেজ আমীরুল সৌদি আরবে গিয়েছিল বেশি উপার্জন ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। বিদেশে যাবার আগে, সে স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল। তখন উপার্জন করত মাসে মাত্র তিন হাজার টাকা। পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। তাই শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে ঢাকায় চলে যায় কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করতে। কয়েক বছর কাজ করার পর সে সৌদি আরবে অভিবাসনের সুযোগ পায়। এই অভিবাসন আমাদের পরিবারের দৈনন্দিন জীবন ও ভবিষ্যৎ বদলে দিয়েছে। সৌদি আরবে যাওয়ার পর থেকে আমার স্বামী প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা আয় করে।

অভিবাসন আমার পরিবারকে আর্থিক নিশ্চয়তা অর্জনে সাহায্য করেছে। আমার স্বামীর স্বপ্ন ছিল একটা সম্মানজনক জীবনযাপনের। সে সবসময় চেয়েছে তার বাড়িটা পাকা হোক এবং শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হতে চলেছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সন্তানের লালনপালন ও ঘরের কাজ সামলানোর পাশাপাশি আমি আমাদের বসতবাড়ি বানানোর কাজ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছি। আমি এবং আমার স্বামী একটা অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছি। সে বিদেশে উপার্জন করে এবং আমি তার পাঠানো টাকা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করে থাকি তার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে। স্বামী স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় আমরা একটা সম্মানজনক জীবন পেয়েছি। আমি আজ তৃপ্ত।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল - বিদেশ যাওয়া

আলিমুদ্দিন

বাংলাদেশ যে বছর স্বাধীন হয় সে বছরে আমার জন্ম। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইসলামপুর গ্রাম আমার জন্ম এবং ২০০৬ সালের আগ পর্যন্ত এই গ্রামেই ছিলাম। অবশেষে ২০০৬ সালে সৌদি আরবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। ভেবেছিলাম বিদেশ গিয়ে নিজের জীবনের উন্নয়ন ঘটাব। কিন্তু অভিবাসন আমার জন্য কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি আনে নাই।

বর্তমানে আমার তিনটি সন্তান, একটা ছেলে ও দুটো মেয়ে। আমার ছেলে ওয়াসিমের জন্ম ২০০৩ সালে। ওয়াসিম একজন বিশেষ শিশু (অটিজম)। আমার স্ত্রী বদরুন্নেসা এবং আমি কেউই এসএসসি পাশ করি নাই। সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছা থাকলেও এ ব্যাপারে মতামত দেওয়ার মতো জ্ঞান আমাদের নাই। সেজন্য স্বপ্ন দেখেছিলাম সৌদি আরবে যাওয়ার। যেন সেখানে গিয়ে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট টাকা উপার্জন করতে পারি এবং নিশ্চিত করতে পারি সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যৎ। আর নিশ্চিত করতে পারি ওয়াসিমের বিশেষ সেবা ও চিকিৎসা।

সৌদি আরবে এসে আমি কখনই স্থায়ী চাকরি পাই নাই ফলে আমার আয় যথেষ্ট ছিল না। সত্যি বলতে কী সৌদি আরবে বাংলাদেশের চেয়েও কম উপার্জন করতাম। প্রতি মাসে আমার উপার্জন ছিল ৬ থেকে ১০ হাজার টাকা। ফলে দেশে টাকা পাঠানো ছিল আমার জন্য খুবই কঠিন। বিদেশ থাকাকালীন আমি প্রতি মাসে দেশে এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাঠাতে পারতাম, যা পরিবারের কোনো কাজেই লাগতো না। যে এজেন্টের মাধ্যমে আমি সৌদি আরবে এসেছিলাম সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একটা স্থায়ী চাকরির। কিন্তু আসার পর তা আর হয় নাই। তার উপর আমি ভালো আরবি বলতে পারতাম না।

দুই বছর চার মাস সৌদি আরবে থাকার পর সিদ্ধান্ত নেই এখানে আর নয়। কারণ পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারছিলাম না এবং আমার পরিবারেরও আমার সাহায্যের প্রয়োজন। পরিবারের আর কোনো পুরুষ সদস্য ছিল না। স্ত্রী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। কারণ বড় মেয়েটা বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমার পুত্রের চিকিৎসাও ছিল ব্যয়বহুল। এ অবস্থায় আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং আবার দিনমজুরের কাজ করে প্রতিদিন দেড়শ থেকে তিনশ টাকা আয় করতে থাকি। আমার পরিবার এবং বসতবাড়িই হলো বর্তমানে আমার একমাত্র সম্পদ।

বিদেশ যাওয়ার খরচ জোগাতে আমাকে ঋণ করতে হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বিক্রি করেছিলাম আমার অন্যান্য সম্পদ। সে সবের কিছুই আর নতুন করে করতে পারি নাই। আমার বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আমি অনুতপ্ত। কারণ এতে আমার ভালো কিছুই হয় নাই বরং হয়ে গেছি ঋণে জর্জরিত।

অভিবাসন আমাকে ধ্বংস করেছে

সাজেদা

আমি সাজেদা। বরিশাল জেলার আগৈলঝড়ায় বাড়ি। শিশুকাল এখানেই কেটেছে। আমি বাড়ির বড় সন্তান। নবম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। আমরা চার বোন এক ভাই। বাবা ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। প্রথম সন্তান হিসেবে আমি সিদ্ধান্ত নেই কিছু একটা করার যাতে পরিবারকে সাহায্য করা যায়। মেয়ে হয়েও আমি ছেলেদের মতো এ চিন্তা করতাম। ভাবতাম আমি আয় করে ভাইবোনদের লেখাপড়া শিখাবো। নিজের বিয়ের খরচের জন্য টাকা জমাবো। আরও স্বপ্ন ছিল জীবনে পাবো একজন চরিত্রবান স্বামী। কিন্তু অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা সে আশা পূরণ করেনি। সৌদি আরবে আমার অভিবাসন আমার পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সৌদি আরব অভিবাসনের সুযোগ সম্পর্কে শুনেছিলাম স্কুলের একটা মেয়ের কাছে। সে নিজেও বিদেশ যেতে চাইত। দালাল বলেছিল আমার উপার্জন আমাদের সামাজিক অবস্থা বদলে দেবে এবং পরিবারের জন্য বয়ে আনবে আর্থিক স্বচ্ছলতা। এসব শুনে ২০০৬ সালে একুশ বছর বয়সে বিদেশ গিয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম অর্থ উপার্জনের এবং বাবার কাঁধ থেকে পরিবারের বোঝাটা কমিয়ে আনার। অভিবাসনের খরচ যোগাতে আমার পরিবার বাধ্য হয়েছিল ঋণ করতে এবং সেই ঋণ নেওয়া হয়েছিল চড়া সুদে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম এটা এমন একটা বিনিয়োগ, যা দ্রুত উঠে আসবে।

আমাকে বলা হয়েছিল সৌদি আরবে আমি গৃহকর্মীর কাজ করতে যাচ্ছি। কিন্তু দালাল তিন মাসেরও বেশি সময়ে সেই কাজের ব্যবস্থা করতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত যখন একটা বিউটি পার্লারে আমাকে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন তা ছিল একটা বিশাল হতাশা। এই চাকরিতে বেতন মোটেও ভালো ছিল না এবং কাস্টমারদের কথা বুঝতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল কারণ আমি আরবি জানতাম না। প্রথম তিন বছর আমি দেশে কোনো টাকা পাঠাতে পারিনি। আয় ছিল খুবই কম।

সবসময় পরিবারের অভাব অনুভব করতাম এবং নিঃসঙ্গতায় ভুগতাম। কিছুদিন পর আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেই। আমার দেশে ফিরে আসাটা মনে হয়েছিল ভয়াবহ ব্যর্থতা। ঋণের কারণে এবং পরিবারকে যে কষ্ট দিয়েছি সেই কারণে আমি দারুণভাবে লজ্জিত। আমার বাবা পরিবারটিকে চালানোর জন্য আগের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করে।

আমার বৃদ্ধ বাবাকে আর মাঠে কাজ করতে হয়না

আবদুল মঈন

আমার বয়স ৩৭ বছর। আমি দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি এবং সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে-আসা একজন অভিবাসী। স্কুল থেকে ঝরে পড়ার পর আমি বাবার সঙ্গে কৃষিজমিতে কাজ করতাম। পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেই আমাকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যেতেই হবে। কারণ গ্রামে যা রোজগার করতাম তা দিয়ে সংসার চলতো না। ২০০২ সালে কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাই। আমার পরিবার আশা করত যেন আমি একটা বাড়ি বানাতে পারি।

সৌদি আরবে আমি একজন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলাম। এক বছরের ভেতরে কাজটা আমি শিখে ফেললাম এবং যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন করতে লাগলাম। দক্ষ টেকনিশিয়ান হওয়ায় আমার বেতন ছিল বছরে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা। গত এক বছরে (২০১৩-১৪) আমি দুই লাখ ২০ হাজার টাকা দেশে পাঠাতে পেরেছি। আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে তৈরি হয়েছে আমাদের পাকা বাড়ি। আমার পাঠানো টাকার কিছু অংশ স্থানীয় মসজিদ ভবন নির্মান তহবিলে দান করা হয়েছে। চাচাতো ভাইকে সাহায্য করেছি একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলতে।

আমি বাংলাদেশে ফিরে এলেও আবার বিদেশ যাব। কারণ সেখানে আরও ভালো বেতন পাওয়া যাবে। বিদেশ যাওয়ার আগে আমরা ছিলাম ভূমিহীন। অন্যের জমিতে বর্গাচাষ করতাম। বর্তমানে আমাদের নিজের জমি হয়েছে। সম্প্রতি যেসব সম্পদ আমি অর্জন করেছি এবং আমার যাবতীয় সঞ্চয় সবই হলো একজন অভিবাসী শ্রমিকের উপার্জনের একক ফলাফল। স্থানীয় বাজারে একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছি। আমার বাবার বয়স বর্তমানে ৬৫ বছর। আমাদের বর্তমান সমৃদ্ধির কারণে তার এখন আর মোটেও কৃষিজমিতে কাজ করার প্রয়োজন নাই। তার পরিবর্তে সে এখন দোকানের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

অভিবাসনের কারণেই আজ আমি ধনী

আবদুল তারেক

সর্বমোট দশ সদস্যের এক বিশাল পরিবার আমাদের। আমরা কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা। আমার এক ভাই কুষ্টিয়া শহরে ব্যবসা করে, অন্য ভাই কাজের উদ্দেশ্যে ঢাকায় গিয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার এক আত্মীয় জানায় যে, তার কাছে একটা সৌদি আরবের ভিসা আছে, যা সে বিক্রি করতে চায়। আমি তখন কাজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার পরিবারও সাহায্য করতে রাজি হয়। ফলে ১৯৯৮ সালে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা খরচ করে সৌদি আরব যাই। সৌদি আরবে একটি সেবামূলক শিল্প প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। এখনও সেখানেই কাজ করছি এবং আমাকে বেতন দেওয়া হচ্ছে প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা। প্রতি দুই থেকে তিন মাস পর আমি আমার বাবাকে টাকা পাঠাই। সম্প্রতি দুই লাখ টাকা পাঠিয়েছি। ২০১২ সালে আমার পাঠানো ছয় লাখ টাকা খরচ করে আমার পরিবার একটা পাকা বাড়ি বানিয়েছে। পাশাপাশি আমার টাকা চাষাবাদের কাজেও

ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের কৃষিজমির পরিমাণ ৬৬ ডেসিমেল। নিশ্চিতভাবেই আমি বিদেশ না গেলে এসব কোনো কিছুই সম্ভব হতো না। পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়টা পুরোপুরিই সম্ভব হয়েছে আমার অভিবাসন এবং আমার ভাইয়ের ঢাকা শহরে উপার্জনের কারণে। এছাড়া আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও সাহায্য করেছে।

আমি ফিরে এসেছি শূন্য হাতে, কিন্তু অনেক কষ্টে ভরা ভারী বুকে

মর্জিনা

আমি মর্জিনা। আমার বয়স ২২ বছর। বিদেশ যাওয়ার আগে আমি সিরাজগঞ্জে একটা জুট মিলে কাজ করতাম। একদিন গ্রামে বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার ঘোষণা শুনলাম মাইকে। তারপর বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সৌদি আরবের রিয়াদে অভিবাসনের সুযোগ পেলাম। আমি পরিবারের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন এবং পরিবারের জন্য কিছু উপার্জন করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যদি একটা বৈধ ভিসা ও কিছু প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ যাই তাহলে সেখানে আমার কাজ পেতে সুবিধা হবে। কোনো সমস্যার মুখোমুখি হব না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি ভুল করেছিলাম। মুখোমুখি হয়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের বাধা ও চ্যালেঞ্জের। একই সাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছিলাম। আমার চাকরিদাতা ছিল খুবই নির্দয়। সে আমাকে কোনো পুষ্টিকর খাবার দিত না এবং তাদের স্থানীয় খাবার খেতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না। যথাযথ পুষ্টির অভাবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এতটাই দুর্বল হয়ে পড়লাম শারীরিকভাবে যে প্রায়ই দুই পায়ের উপর দাড়াতে পারতাম না। কিন্তু ক্লান্ত বা অসুস্থ হওয়ার কোনো সময় সেখানে ছিল না। কাজ করতেই হবে। না হলে হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে তারা আমাকে মারত। তাদের বাড়িতে অতিথি এলে তারা আমাকে আমার ঘরে বন্ধ করে রাখত। ঘরটা ছিল অন্ধকার এবং সারা ঘরে ছারপোকার উপদ্রব। সারা শরীরে ছারপোকার কামড় খেতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তারা মাঝে মধ্যে আমাকে আস্তাবলে উটের সঙ্গে রেখে দিত। কান্নাকাটি কিংবা অভিযোগ করলে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। বাইরের কারো সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়েছিল; তারা আরবিতে কথা বলত, আমি তার কোনো কিছু বুঝতেই পারতাম না। কখনও অভিযোগ করলে তারা বলত আমাকে তারা কিনেছে এবং তার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে। সুতরাং আমি যদি সেই টাকা ফেরত দিই তাহলে তারা আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে।

একদিন যখন কেউ বাড়িতে নেই, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্থানীয় এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করি সাহায্যের জন্য। আরও দুই মাস পার হয়ে যাওয়ার পর আমি সৌদি পুলিশের শরণাপন্ন হই। তারপর বাংলাদেশ ফিরে আসি। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল টাকা আয়ের জন্য কিন্তু আমি ফিরে এসেছি শূন্য হাতে কিন্তু অনেক কষ্ট ভরা ভারী বুকে।

আমার বোনের বিয়েতে সানাই বেজেছিল

কামাল ইসলাম

আমি কামাল ইসলাম। কুমিল্লা জেলায় বসবাসকারি একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। অল্প বয়সে আমার বাবা মারা যায়। পাঁচ ভাই, তিন বোন এবং মাকে নিয়ে আমাদের পরিবার। আমার বড় ভাই বিদেশে কাজ করত এবং তার সহযোগিতায় আমার দুই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। অন্য ভাই ও বোন লেখাপড়া করত। নিজেদের অল্প কিছু কৃষিজমি ছিল, কিন্তু সেই জমির আয়ে আমাদের সংসার চলত না।

এসএসসি পাশ করার পর আমি আর লেখাপড়া করি নি। ভালো একটা চাকরি পাওয়ার জন্য এই লেখাপড়া যথেষ্ট ছিল না। বড় ভাই আমাকে সৌদি আরব যাওয়ার একটা ভিসা যোগাড় করতে সাহায্য করেছিল এবং বৈধ ভিসার কারণে সেখানে চাকরি পেতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। যে কোম্পানিতে কাজ করতাম তারা আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু খাবার খরচ আমি বহন করতাম। প্রতিমাসে বেতন পেতাম ৩৫ হাজার টাকা এবং আমার জীবনযাপনের খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা দেশে পাঠাতাম। এই অর্থ দিয়ে আমার পরিবার একখন্ড জমি কেনে এবং সেখানে একটা বাড়ি বানায়। আমার ছোট বোনেরও বিয়ে হয়ে যায়। আমি এবং আমার ভাইয়ের পাঠানো রেমিটেন্স থেকেই বোনদের বিয়ের যাবতীয় খরচ মেটানো হয়েছে। আমার বোনের শখ অনুযায়ী তার বিয়েতে সানাই বেঁজেছে।

বোনের যে বছর বিয়ে হয় সে বছরই আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং নিজেও বিয়ে করি। বর্তমানে আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। আমরা দুই ভাই মিলে একটা মুদির দোকান চালু করেছি। রামরু'র ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন আমি বেকার ছিলাম। আসলে বিদেশ থেকে ফেরার পর কাজ পাওয়া বেশ সমস্যা। যে সে কাজে যোগ দিতে মন চায়না তাই আয় কমে যায় ভীষণভাবে। এখন আমি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। ড্রাইভিং শেখার ব্যাপারে আমার আগ্রহ প্রচুর। কারণ বিদেশে ড্রাইভারদের ভালো বেতন দেওয়া হয়। যদি আবার সুযোগ পাই এবং বেশি টাকা খরচ করতে না হয় তাহলে আবার সৌদি আরব যাব। আর যদি দেশে থাকি তাহলে একটা গাড়ি কিনব এবং নিজে গাড়ি চালিয়ে অর্থ উপার্জন করব। প্রথমে গাড়ি চালাব ঢাকা শহরেই। অবস্থা স্থিতিশীল হলে কুমিল্লায় ফিরে যাবো।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

আজ আমরা আর পরাজিতদের দলে নই

আজম উদ্দিন

আমি আজম উদ্দিন চট্টগ্রামের চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা। আমার ভাই বেলাল উদ্দিন এবং আমি অল্প বয়সে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমি একটা স্থায়ী চাকরি পেলেও আমার ভাই পায় নাই। ফলে জীবনের পাঁচটা বছর সেখানে অপচয় করে সে বাংলাদেশে ফিরে আসে। বেলাল যখন দেশে ফিরে যায় তখন তার কাছে খুব সামান্য টাকা ছিল। আমি তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম যা দিয়ে সে একটা মুরগির খামার চালু করে। শুরুতে তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার উন্নতি হতে থাকল।

বর্তমানে আমাদের সেই ছোট মুরগির খামারটি বিশাল ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এই খামারে এখন ১৫শ লেয়ার মুরগির আছে এবং প্রতিদিন গড়ে ১৩শ ডিম হয়। পাশাপাশি ১৫শ ব্রয়লার মুরগিও আছে খামারে। আমরা দুইভাই প্রায় ১২ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছি এই খামারে। আমরা ব্যবসাকে এখন বহুমুখী করার পরিকল্পনা করছি। প্রাথমিকভাবে আমি কিছু কৃষিজমি কিনেছি। সেই জমিতে ধানসহ বিক্রির জন্য উৎপাদিত শস্যের চাষাবাদ করি। আমাদের নিজস্ব পাওয়ার টিলার ও রাইস মেশিন রয়েছে। দোকান, খামার ও কৃষিকাজে কমর্সংস্থান হয়েছে ১২ জন লোকের। পরিবারের লোকেরা কখনও চিন্তা করে নাই যে বেলাল এতসব দায়িত্ব পালন করতে পারবে। পরিশ্রম এবং যথার্থ পরিকল্পনাই আমাদের উন্নয়নের প্রধান কারণ। আমাদের পরিবার ২০১১ সালে রামরু'র সোনার মানুষ সেরা রেমিটেন্স ব্যবহারকারী পরিবার পুরষ্কার লাভ করে।

ছিলাম ট্রাবল মেকার হলাম মানি মেকার

নাসিরুল হক

আমি নাসিরুল হক। আমি ১৯৯০ সালে বিদেশ গিয়েছিলাম পরিবারের অবস্থা উন্নয়নের জন্য। অবশ্য কিছু ব্যক্তিগত কারণও ছিল। প্রায়ই আমার এলাকার বিভিন্ন কলহ-বিবাদে আমি জড়িয়ে পড়তাম। ফলে পরিবারের লোকেরা চাইত আমি দেশের বাইরে চলে যাই। দীর্ঘ ২৩ বছর আমি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কর্মরত ছিলাম। দোকানে সেলস্‌ম্যান হিসেবে স্থায়ী চাকরি পাওয়ার আগে আমি বিভিন্ন ধরনের চাকরি করেছি। কারণ, আমি যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

আমার অভিবাসনে খরচ হয়েছিল ৮০ হাজার টাকা। টাকাটা যোগাড় করেছিলাম ঋণ করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছানোর পর আমি চেষ্টা করেছিলাম যেন যত দ্রুত সম্ভব ঋণটা পরিশোধ করা যায়। কারণ আমি চাই নাই আমার পরিবারের লোকেরা ঋণদাতার দিক থেকে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হোক। ঋণ করে এসেছি বলে আমার ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ

ছিলনা। বরং এই কারণেই আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম কঠোর পরিশ্রম করতে। আমি উপার্জিত অর্থ দিয়ে সীতাকুণ্ডের মহাদেবপুর এলাকায় ২০ লাখ টাকা খরচ করে একটা বাড়ি করেছি। সেই বাড়িতে আমি নিজে থাকি এবং কিছু অংশ ভাড়া দিয়েছি। এছাড়াও স্থানীয় বাজারে ২০ লাখ টাকা খরচ করে একটি কাপড়ের দোকান চালু করেছি। এই ব্যবসার দায়িত্ব দিয়েছি আমার জামাতাকে।

সম্প্রতি সীতাকুন্ড কলেজ রোডে আমি একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলতে যাচ্ছি। নাম দিয়েছি 'শাহনাজ'। এটা নয় লাখ টাকার একটা বিনিয়োগ। এছাড়া চালু করেছি পরিবহন ব্যবসাও; তিনটি সিএনজি ও তিনটি মাইক্রোবাস নিয়মিত চলছে। আমার ব্যবসায় কর্মসংস্থান হয়েছে ২৫ জন লোকের এবং এসব ব্যবসা থেকে মাসে প্রায় দেড় লাখ টাকা আয় করি। এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে আমার বিদেশে অর্জিত টাকার যথাযথ ব্যবহারের কারণে। বিদেশ গিয়ে শুধু টাকা উপার্জনই যথেষ্ট নয়। অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা এবং সেই সঙ্গে তা ব্যবহারের কৌশল। তাহলেই সমাজে তার অর্থপূর্ণ প্রভাব পড়তে বাধ্য। আমার কোনো প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা ছিল না, কিন্তু দ্রুত চিন্তা করা ও কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা আমার আছে, যা আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

আমি বিচার পেয়েছি, বিএমইটি-কে ধন্যবাদ

মোহাম্মদ শাহেদ মিয়া

আমি টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার কাউজান উত্তর বড় গ্রামের বাসিন্দা। বাবার নাম বাদশা। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করতে বাবা আমাকে দুবাই পাঠিয়েছিল। খরচ হয়েছিল দুই লাখ ৮৫ হাজার টাকা। দালালের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী দুবাইতে আমার বেতন ধরা হয়েছিল প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আমাকে দেওয়া হচ্ছে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা। এই কম বেতন আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারপরও বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে সেখানেই কাজ করতে থাকি।

হঠাৎ করেই কোনো কিছু না জানিয়ে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কোম্পানি আমাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ফিরে আসার পর যা ঘটেছে সে সম্পর্কে দালালের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, কিন্তু সে আমাকে এড়িয়ে যেতে থাকে। আমার দুরবস্থার কথা শুনতেই চায় না। অবশেষে সে জানায়; এটা আমার দোষ এবং আমার ভুলের কারণেই ফিরে এসেছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমি বাধ্য হয়েছিলাম।

এরকম দুর্দশায় যখন আমি বিপর্যস্ত তখন আমার এক আত্মীয়ের কাছে জানলাম অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি আমাদের এলাকায় সক্রিয়। তার কথামতো ফুলকি অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি আয়োজিত সভায় উপস্থিত থেকে বিএমইটি-র উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে পারি যে এই প্রতিষ্ঠান নির্যাতিত ও বঞ্চিত অভিবাসীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে থাকে। তারপর কমিটির পরামর্শ অনুসারে এবং রুরাল পুওর ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আরপিডিও-র

সহযোগিতায় ২০১৫ সালের ২৯ জানুয়ারি বিএমইটিতে অনলাইনের মাধ্যমে নিয়মানুগ ও যথাযথ আভিযোগ দায়ের করি। ২০১৫ সালে ১৮ মার্চ শুনানীর পর বিএমইটি ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। এই বিপন্ন পরিস্থিতিতে দুঃখকষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও আংশিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় আমি কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছি ও সন্তুষ্ট হয়েছি।

যে কোনো সময় আমার চাকরি চলে যেতে পারে

আশরাফুল মিয়া

টাঙ্গাইলের করটিয়া উপজেলার ভাতকুড়া গ্রামের বাসিন্দা আমি। মূলত কৃষিনির্ভর পরিবার হলেও খুব বেশি জমি আমাদের নেই। ফলে খুব কষ্টকর অবস্থায় দিন কাটাতে হতো। যে পরিমাণ ধান আমাদের জমিতে উৎপাদন হতো তা পরিবারের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ পরিবারের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ১৫ জন। যদিও বড় ভাই সৌদি আরবে কাজ করত, কিন্তু সে যা টাকা পাঠাত তাও যথেষ্ট ছিল না। এদিকে আমি সে সময়ে বিয়ে করেছি। সুতরাং নিজের পরিবারের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে।

পরিবারের জন্য আরো বেশি আয় করতে ২০০৪ সালে আমি দুবাই গিয়েছিলাম বিশ বছর বয়সে। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল দুই লাখ টাকা। আমার কোনো টাকা ছিল না বলে কিছু জমি বিক্রি করেছিলাম এবং বাকি টাকা ধার করেছিলাম পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। দুবাই যাওয়ার পর একটা চাকরি পেয়ে যাই এবং প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা আয় করতে থাকি। আমার প্রাত্যহিক খরচ বাদ দেওয়ার পর খুব কম অর্থই দেশে পাঠাতে পারতাম। মূল চাকরির পাশাপাশি কিছু বাড়তি কাজ করতে শুরু করেছিলাম। দেশে টাকা পাঠাতাম মাঝে মাঝে। দুবাই এর কাজের পরিবেশ অভিবাসীদের জন্য মোটেও ভালো ছিল না। দেখা যেত বহু লোককে কোনো সতর্কীকরণ ছাড়াই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমি জানতাম এটা আমার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। যে কোনো সময় চাকরি হারাতে পারি এবং দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। আমি সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। সেই অর্থ দিয়ে আমার পরিবারের জন্য একটা টিনের বাড়ি করেছি। আমার পাঠানো টাকা দিয়ে দুই বোন এবং ভাতিজির বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার ছোট বোন লেখাপড়া করছে এবং ছোট ভাই আইন পড়তে শুরু করেছে। ছোট ভাইয়ের নাম সুলতান মিয়া। সে বাংলাদেশে থাকতে চায় দেশের জন্য কিছু করতে চায়। পরিবারের যাবতীয় খরচ বলতে গেলে আমাকেই বহন করতে হয়। সবাই আমার উপরই নির্ভরশীল। প্রতিদিন সকালে কাজে যেতে যেতে ভাবি চাকরিটা হঠাৎ চলে গেলে আমাদের কি হবে?

মেয়েকে দেখার লোক ছিলনা, তাই দেশে ফিরতে হয়

সেলিনা বেগম

আমি সেলিনা বেগম। টাঙ্গাইল জেলার নাগরজলফৈ গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন ফেরত আসা অভিবাসী। আমার স্বামী একজন ড্রাইভার। কিন্তু তার আয়ে সংসার চলত না। সে সময়ে

আমার একমাত্র মেয়ে স্কুলে পড়ে এবং আমি চাইতাম সে লেখাপড়া চালিয়ে যাক। এসব কারণে ২০১৩ সালে আবুধাবী গিয়েছিলাম কাজের উদ্দেশ্যে। সে সময় আমার বয়স ছিল বিশ বছর এবং অভিবাসনের খরচ হয়েছিল ৩৫ হাজার টাকা। সৌভাগ্যজনকভাবে কারও কাছ থেকে ঋণ করতে হয় নাই। আমার সঞ্চয়ের টাকা দিয়েই খরচ মেটানো গিয়েছিল। চুক্তি অনুসারে আমার বেতন ছিল প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকা। বিদেশে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। বিদেশী লোকের আচরণ কেমন হয় সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা ছিল না। কেবলই স্বপ্ন ছিল কঠোর পরিশ্রম করার। টাকা আয় করার। মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর।

আমার প্রতি চাকরিদাতার আচরণ ছিল খুবই খারাপ। যে বাড়িতে কাজ করতাম সেখানে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল বার জন- গৃহকর্তা, তার দুই স্ত্রী এবং দুই স্ত্রীর সন্তানেরা। তারা মোটেও ভদ্র ছিল না। সবসময় খারাপ ভাষায় কথা বলত। বাধ্য করত আমাকে অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে থাকতে। নিয়মিত খাবার দিত না। আমাকে অসম্মান করার পাশাপাশি গরিব বলে হেয় প্রতিপন্ন করত। আমার খুবই কষ্ট হতো। সে সময় আমার মা মারা যায়। মা-ই আমার চৌদ্দ বছরে বয়সী মেয়ের দেখাশোনা করত। তাই দুই বছর বিদেশে থেকে ২০১৫ সালে দেশে ফিরে এলাম। এ মূহুর্তে আমার কোনো কাজ নাই। সংসার দেখাশোনা করি। স্বামী এখনও ড্রাইভারি করে। তার রোজগার এখনও খুব বেশি না। তবে তা দিয়ে সংসার মোটামুটি চলে যায়। আমি আর বিদেশ যেতে চাই না। অনেক আশা নিয়ে আবুধাবী গিয়েছিলাম। কিন্তু চাকরিদাতার পরিবার আমার সঙ্গে শোভন আচরণ করে নাই। সুতরাং আর বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করব না। গরিব বলে মানুষকে যারা হেয় করে তাদের সঙ্গে কাজ করা কঠিন। এমনকি বেশি বেতন দিলেও এরকম লোকের সঙ্গে কাজ করতে চাই না।

থাকলে অভিবাসী পরিবারে, ছেলের বাড়ির ডিমান্ড যায় বেড়ে

জুনায়েদ আলম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ধর্মপুর গ্রামে আমার বাড়ি। বাবার একখণ্ড কৃষিজমি ছিল যেখানে ধান হতো। কিন্তু তাতে সংসারের খাবার যোগান হতো না। বড় ছেলে হিসেবে পরিবারকে সাহায্য করার দায়িত্ব অনুভব করতাম। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল দশজন: দুই ভাই, তিন বোন, মা, আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছোট ভাইবোনেরা লেখাপড়া করত। যদিও আমার একটা চাকরি ছিল কিন্তু তাতেও পরিবারের প্রয়োজন মিটত না।

এসব কারণে ২০১২ সালে ৩৯ বছর বয়সে আমি বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। দুবাই যেতে তখন আমার খরচ হয়েছিল পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। জমি বিক্রি করে ও আত্মীয়স্বজনের কাছে ঋণ নিয়ে টাকা জোগাড় করেছিলাম। দুবাই যাওয়ার পর চাকরি পেয়েছিলাম একটা ইলেকট্রনিকস-এর দোকানে। বেতন ছিল মাসে ৩৫ হাজার টাকা। আমার খরচ মিটিয়ে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাতাম। পাশাপাশি আমি আমার ঋণও পরিশোধ করতে পেরেছি। ইতিমধ্যে আমার অন্য ভাই চট্টগ্রাম শহরে কাজ করতে শুরু করেছে এবং সেও বাড়িতে টাকা পাঠাতো। আমাদের গ্রামের বাড়িটি সংস্কার করা হয়েছে। দুই তলার ফাউন্ডেশন দিয়ে একতলা

বাড়ি বানানো হয়েছে। দুই ভাইয়ের যৌথ উপার্জন এবং বাবার কৃষিজমির ফসলে আমাদের এখন ভালোই চলছে। আমার বোন ও আমার কন্যার সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। অনেক টাকা যৌতুক দিতে হয়েছে। কারণ সবাই জানে যে এই বাড়ির এক ছেলে বিদেশ থাকে। মেয়ের বিয়েতে খরচ করেছি পাঁচ লাখ টাকা। আমার একমাত্র ছেলে বর্তমানে কলেজে পড়ছে। আশা করি লেখাপড়া শিখে সে মানুষের মতো মানুষ হবে। মাঝে মাঝে ভাবি বিদেশ গিয়ে কাজ করার ফলেই আমার জীবনে এই সাফল্য এসেছে এবং আরও মনে হয়- আমি ধনী।

প্রথমত পরিবারের জন্য এবং তারপর আমার জন্য

জনাব রাকেশ দেবনাথ

আমি চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার দারোগাহাট গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। আমার পরিবার মোটেও স্বচ্ছল ছিল না। তিন বোন, বাবা ও মাকে নিয়ে আমার সংসার। কোনো জমিজমা ছিল না আমাদের। বাবা লিজ নেওয়া জমিতে পান চাষ করত। কিন্তু পান চাষে আয়ের চেয়ে খরচ হতো বেশি। ফলে তা আমাদের মাথার ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং এই বোঝা হালকা করার জন্য আমরা কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম যেন আরও বেশি পানের চাষ করতে পারি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পরিকল্পনা সফল হয় নাই। আমার অভিবাসনের আগেই বাবা তিন লাখ টাকা খরচ করে বড় বোনের বিয়ে দেন। বোনের স্বামী একজন অভিবাসী। তার অনেক টাকা। সে এখন বিদেশে আছে। তা সত্ত্বেও আমার বাবা মেয়েকে গহনা, আসবাবপত্র এবং অনেকগুলি শাড়ি দিয়েছিলেন। এতে মনে হয় যে, অভিবাসী পরিবারের লোকদের বিয়ের সময় বেশি টাকা খরচ করতেই হবে।

বিয়ের খরচ মেটাতে বাবা অনেক ঋণ করেছিলেন। আমি অবশ্য খুব বেশি আপত্তি করি নাই। কারণ আমার ভগ্নিপতি আমার জন্য একটা ভিসা পাঠিয়েছিল এবং সাহায্য করেছিল অল্প খরচে বিদেশ যেতে। ২০১৩ সালে ২৪ বছর বয়সে একজন দালালের সহযোগিতায় আমি আবুধাবীতে যাই। এই দালাল ছিল আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল এক লাখ ৭০ হাজার টাকা, যা আমার বাবা স্থানীয় বণিক সমিতি থেকে ঋণ করেছিল। আমার ভাগ্য ভালো ছিল। কারণ আবুধাবীতে যাওয়ার এক সপ্তাহের ভেতর প্লাম্বার হিসেবে একটা চাকরি পেয়ে যাই। যদিও এ কাজে কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। বেতন পেতে শুরু করলাম প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকা। কিন্তু নিজের জন্যই সব টাকা খরচ হয়ে যেতে লাগল। দেশে কোনো টাকা পাঠাতে পারতাম না। যাইহোক, প্রায় এক বছর কাজ করার পর আমার বেতন বেড়ে দাঁড়ালো ২০ হাজার টাকায়। তখন তখন প্রতি মাসে ৭-৮ হাজার টাকা দেশে পাঠাতে শুরু করলাম। দুই বছর সেখানে কাজ করে পরিশোধ করেছিলাম বণিক সমিতির ঋণ। এক লাখ টাকা সঞ্চয় নিয়ে আমি ২০১৬ সালে দেশে ফিরে আসি। সেই টাকা দিয়ে আমার দুই বোনের বিয়েতে সাহায্য করেছি কিন্তু তারপরও কিছু ঋণ করতে হয়েছিল। আমি আবার বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছি। এবার পরিকল্পনা করছি নিজের জন্য কিছু করার। আমার কাছে কিছু কাজের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু

বেতন খুবই কম বলে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। যদি আবার বিদেশ যাই তাহলে বেতন হতে হবে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। কারণ আমি এখন একজন দক্ষ প্লাম্বার। তবে সমস্যা হলো, দক্ষ প্লাম্বার হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনো সার্টিফিকেট নেই যা আমি দেখাতে পারি। ভাবছি সার্টিফিকেট যোগাড়ের একটা উপায় বের করবো।

সবাইকে বলি ভোগের আগে বিনিয়োগ

শাফাকাত হোসেন

আমার নাম শাফাকাত হোসেন। চট্টগ্রামের ফুলগাছিপাড়া গ্রামে আমার বাড়ি। আমি একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। চার ভাই, দুই বোন এবং মাকে নিয়ে আমার পরিবার। আট বছর আগে আমার বাবা মারা গেছে। তখন বোনদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। বড় দুই ভাইয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো এবং তারা ড্রাইভারের চাকরি করতো। আমার মেজ ভাই কাজ করত হোটেলে। ছোট ভাই লেখাপড়া করছিল। কিন্তু আমি ছিলাম বেকার।

দেশে আমি কোনো চাকরি পাই নাই। সে কারণে ২০১২ সালে চব্বিশ বছর বয়সে দুবাই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই দুই লাখ ১০ হাজার টাকা খরচ করে। এই কাজে সাহায্য করে আমার খালাতো ভাই এবং সে একজন দালাল। আমি সত্যি ভাগ্যবান যে, অভিবাসনের খরচ যোগাড়ের জন্য আমাকে ঋণ করতে হয় নাই। বাবা মৃত্যুর সময় আমার জন্য কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সেই টাকাই আমি কাজে লাগাই। দুবাই গিয়ে আমি সুপার মার্কেটে সেলস্‌ম্যান হিসেবে একটা চাকরি পেয়ে যাই। বেতন মাসে ১৮ হাজার টাকা। আমি নিয়মিত বেতন পেতাম এবং ভালো অঙ্কের টাকা দেশে পাঠাতে পারতাম। বর্তমানে আমার ভাইদের স্ত্রী ও সন্তানসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১৩ জন। আমি সব সময়ই আমার বড় ভাইয়ের একাউন্টে রেমিটেন্স পাঠাই। আমার পাঠানো টাকার একটা অংশ দিয়ে আমার পরিবার সীতাকুণ্ডতে একটা রেস্টুরেন্ট চালু করেছে। ভালো আয় হচ্ছে সেখান থেকে। আমার বড় ভাই এবং ছোট ভাই মিলে রেস্টুরেন্ট চালায়। অন্য দুই ভাই বাসের ড্রাইভার। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে এলে আমি ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে দেশে ফিরে আসি। দেশে আমার কোনো কাজ করার ইচ্ছা নাই। আমি আবার বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। অভিবাসী হিসেবে আমি সফল। কারণ পরিবার বিচক্ষণতার সঙ্গে আমার পাঠানো টাকা ব্যবহার করেছে।

বিধবাদের দুঃখ বুঝি, তাই তাদের জন্য কিছু করতে চাই

রাসমিন আক্তার

আমি রাসমিন আক্তার। আমি গত পাঁচ বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজ করেছি এবং শুধুমাত্র ছুটিতেই বাড়িতে এসেছি। তের বছর বয়সে বাবা মারা যায় এবং আমাদের পরিবার তখন আমার খালার বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করে। কিছুদিন পরই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে খালা। সে সময় আমি অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। আমার স্বামী ছিল একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

বিয়ের দেড় বছর পর স্বামী মারা যায়। আমি বাবার বাড়িতে ফিরে আসি এবং এই ছোট বাড়িতে আমার কন্যাকে নিয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করতে থাকি। অবশ্যই সেটা ছিল আমার জন্য খুবই কঠিন সময় এবং আমি তখন বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। সে সময় এক আত্মীয় এসেছিল আমাদের বাড়িতে এবং আমাকে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল। তার প্রস্তাব অনুযায়ী ইনস্যুরেন্সের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। এই চাকরি থেকে যা আয় হতো তা বেঁচে থাকার জন্য ছিল যথেষ্ট। ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় অবসর সময়ে আমি দর্জির কাজ শিখেছিলাম। ফলে একটা সেলাই মেশিন কিনি এবং চাকরির পাশাপাশি সেলাইয়ের কাজ করতে থাকি। চাকরি ও সেলাইয়ের আয় একত্রিত করে বসতবাড়ির জন্য আরও দুই ডেসিমেল জমি কেনা সম্ভব হয় যার খরচ পড়ে ১৪ হাজার টাকা।

এ সময় আমার বড় ভাই বিয়ে করে। ভাইয়ের আর্থিক দুরবস্থার কারণে আমি নিয়মিত তাদেরকে সাহায্য করতে থাকি। এক সময় এসব কাজ করে পরিবারের যাবতীয় চাহিদা মেটানো আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন এক আত্মীয় পরার্মশ দেয় বিদেশ যাওয়ার। আমি ভাবি পরামর্শটা মন্দ নয়। কিন্তু অভিবাসনের খরচ জোগানোর মতো টাকা আমার ছিল না। সেই আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যাংকের কাছে বাড়ি বন্ধক রেখে ঋণ নেই। মেয়েকে ভাইয়ের কাছে রেখে ২০০৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলে যাই। বিদেশে উপার্জিত টাকা থেকে ছয় লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করি। তবে তা এখন বন্ধ আছে। আমি একটা সেলাই মেশিন কিনেছি। একটা ২১ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন ও ফ্রিজও কিনেছি। সেই সঙ্গে আমার শোয়ার ঘরের জন্য একটা বক্স-খাট কিনেছি। বাড়িতে পানির লাইনের সংযোগ দেয়া ও একটা পানির পাম্প কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। একটা কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার জন্য ছোট ভাই কর্মকর্তাদের কিছু টাকা দিয়েছে। সেই টাকার জোগানও দিয়েছি আমি।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজ করার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি। ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে ঢাকা শহরে একটা ফ্ল্যাট কিনব। দেশের অসহায় বিধবাদের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছাও আমার আছে। আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি এবং সেজন্য আমিরাত থেকে কিছু গহনাও কিনে এনেছি। অভিবাসন আমাকে সাফল্য দিয়েছে। এখন আর কোনো আফসোস নেই।

বদলে যাব, বদলে দেব, সেক্ষেত্রে অভিবাসন ছাড়া পথ কই?

আবদুল সিদ্দিক

আমার ভবিষ্যত বদলানোর জন্য অভিবাসনই ছিল একমাত্র পথ। ময়মনসিংহ জেলার কুল্লাব গ্রামে আমার বসবাস। অভিবাসনের আগে আমার পরিবার খুবই খারাপ অবস্থায় দিন কাটছিলো। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু এ জীবন আমি চাই নি। তাই নিজের ও পরিবারের অবস্থা বদলানোর জন্য একমাত্র উপায় ছিল অভিবাসন।

আমি ২০০১ সালে দুবাই গিয়েছিলাম। তখন খরচ হয়েছিল এক লাখ ৫০ হাজার টাকা। বিদেশে কাজ করার সময় লক্ষ্য ছিল পরিবারের জন্য কিছু কৃষিজমি কেনা, পরিবারকে সাহায্য করা ও সন্তানদের বেড়ে ওঠার জন্য আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু দুবাই পৌঁছানোর পর দালালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ ও বেতন কোনটাই পাওয়া গেল না। দেখা গেল, বেতনও কম কাজও ভিন্ন। বেতন কম হওয়ার কারণে আমি প্রায়ই তিন বেলা খেতে পারতাম না। দুবাইতে আমার প্রথম দিকের জীবন ছিল এক অর্থে দুর্দশাগ্রস্ত।

তারপরও, গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগলাম। দিনে দিনে আমার অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করল। আমি পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করতে লাগলাম এবং সাহায্য করতে থাকলাম পরিবারকে। আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে কিছু কৃষিজমি কেনা হয়েছে এবং একটা নতুন বাড়ি বানানো হয়েছে। একই বছর আমি আমার ভাইদেরকে সাহায্য করেছি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কাজ পেতে। আমার পাঠানো রেমিটেন্স আমার সন্তানদের বিয়ের সময় সাহায্য করেছে। এখন সচ্ছলভাবেই দিন কেটে যায়। সেই সঙ্গে কিছু সঞ্চয়ও করেছি। আমার গ্রামের বহু লোকই কৃষিজমিতে শ্রম দিয়ে পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে তারাও আমার মতো অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে বিদেশ যাচ্ছে। অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে গিয়ে বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে তারা। আবার অনেকে তাদের পরিবারের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে এবং একই সঙ্গে সন্তানদের লেখাপড়াও করাচ্ছে।

আবারও একবার ভাগ্যের পরীক্ষা করতে চাই

জামিলা

আমি মাদারীপুর জেলার গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমি ২০০৭ সালে দুই বছরের ভিসা নিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে দুবাই গিয়েছিলাম। খরচ হয়েছিল ৯০ হাজার টাকা। চড়া সুদে এ টাকা ঋণ করেছিলাম। দুবাইতে আমি কাজ করতাম একটা হাসপাতালে। বেতন ছিল প্রতি মাসে ১৪ হাজার টাকা। এছাড়াও অবসর সময়ে বিভিন্ন বাড়িতে ঘরের কাজ করতাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার চাকরিদাতার সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল। সে আমার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং এক বছরের বেতন পরিশোধ করে না। অনেক চেষ্টার পর আমি আরও এক বছরের ভিসা বাড়ানোর বিষয়টা নিশ্চিত করি। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয় নি। কারণ ভালো বেতনের কোনো কাজ আমি আর পাইনি। তারপর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি কিন্তু এখনও কোনো কাজ পাইনি। বর্তমানে আবার আমি বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এবার যাব লিবিয়ায়।

অনেকেই পেরেছে কিন্তু আমি পারি নাই

মোহাম্মদ আবদুল কাদের আজাদ

আমি ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে দুবাইয়ে অভিবাসী হই কনস্ট্রাকশন খাতে কাজ করার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে এ্যালুমিনিয়ামের স্টিল ফিক্সারের কাজ। আমি দালালকে দুই লাখ ২৫

হাজার টাকা দিয়েছিলাম। ভিসা, চাকরি ও যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। আমার বেতন ছিল মাসে ১৮ হাজার টাকা। কোনো ওভারটাইমের ব্যবস্থা ছিল না বলে সঞ্চয় করা ছিল খুবই কঠিন।

দুই বছর কাজ করার পর আমি তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে আসি। ছুটি শেষে যখন ফিরে যাই তখন কোম্পানি আমার চাকরির চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মাথায় তখন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। আমার পরিবারের সঙ্গে ভবিষ্যতের যেসব পরিকল্পনা করেছিলাম তার সবই তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আমার উপার্জনের অধিকাংশটাই খরচ হয়েছে পরিবারের ভরণপোষণের পেছনে। পুরো সময়ের ভেতর একটা মাত্র ভালো কাজ সম্পন্ন হয়েছে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করতে পেরেছি। আর কোনো কিছুই হয় নাই। আমি এখন চেষ্টা করছি দেনামুক্ত হওয়ার; নিজ থেকে যে বোঝাটা আমি মাথায় নিয়েছিলাম। অভিবাসন ছিল আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন।

প্রশিক্ষণের পর আরেকবার সুযোগ নেব

মদিনা বেগম

আমি মাদারীপুর জেলার দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় এক দালালের মাধ্যমে ২০০৬ সালে দুবাই গিয়েছিলাম ৭০ হাজার টাকা খরচ করে এবং এই খরচ বহন করেছিল আমার বড় ভাই। সাড়ে চার বছর দুবাইয়ে কাটিয়ে ২০১১ সালে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। প্রথম দিকে আমাকে বেতন দেওয়া হয়েছিল প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা, কিন্তু দুই বছর পর বেতন বেড়ে দাঁড়ায় মাসে ১২ হাজার টাকায়। ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বুঝে কাজ করাটা ছিল খুবই কঠিন। বিশেষ করে প্রথম তিন মাস। কিন্তু চাকরিদাতা আমার সঙ্গে সব সময়ই ভালো আচরণ করেছে। তার পরিবারের লোকেরা ছিল ধৈর্যশীল। তারা সাহায্য করত প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে। প্রত্যেকের মনোভাব ছিল সহযোগিতামূলক।

অবশ্যই কাজের সময় ছিল দীর্ঘ। প্রতিদিন আমার কাজ শুরু হতো ভোর ছয়টায় এবং কাজ করতাম মধ্যরাত পর্যন্ত। তবে কাজের ফাঁকে প্রায়ই বিশ্রাম নিতাম। দুবাইয়ে থাকাকালীন আমি পরিবারের কাছে পাঁচ লাখ টাকা পাঠিয়েছি। এছাড়া ফেরত আসার সময় সঙ্গে এনেছি আরও পাঁচ লাখ টাকা। এই সঞ্চয় দিয়ে বাড়ির সংস্কার করেছি। বাকি আড়াই লাখ টাকা ব্যাংকে রেখেছি।

এসব অর্জনের জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। বর্তমানে একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি এবং পরিকল্পনা করছি সৌদি আরব যাওয়ার। আশা করছি প্রশিক্ষণ নেওয়ার কারণে আরও ভালো বেতনের চাকরি পাব। আমি এখন আরবি ভালো বলতে ও বুঝতে পারি, যা আমাকে ভালো বেতনের চাকরি নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। যদি সবকিছু ভালোভাবে চলে তবে সৌদি আরবে অভিবাসনের পর দেশে ফিরে অর্থপূর্ণ কিছু করার আশা করছি।

এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই

হক মিয়া

আমি ভালুকা উপজেলার বারদিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বিয়ে করেছি চব্বিশ বছর বয়সে। বিদেশ যাওয়ার আগে আমার স্ত্রী এবং আমি প্রকৃত অর্থেই অর্থকষ্টে ভুগেছি। আমাদের মৌলিক চাহিদাই আমরা কেবল মেটাতে পারতাম কিন্তু কোনো সঞ্চয় ছিল না, ছিল না কোন সম্পদ। আমি মাছ ধরার ট্রলারে শ্রমিকের কাজ করতাম। প্রতি মাসে বেতন পেতাম পাঁচ হাজার টাকা। আমাদের কৃষিজমির পরিমাণ এতটাই কম ছিল যে, চাষাবাদ করে পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না।

আমার ৩৪ বছর বয়সে স্ত্রী প্রথম সন্তানের জন্ম দেয়। এই ঘটনায় আমার মনে পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা আরও বেশি করে প্রতিফলিত হতে থাকে। বিশেষ করে পরিবারের ভবিষ্যৎ আমাকে বেশি ভাবায়। সিদ্ধান্ত নেই, কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতেই হবে। তারপর ২০০৪ সালে একজন দালালের সাথে আলাপ করলে সে আমাকে কাজের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেতে সাহায্য করে। সেখানে গিয়ে একটি দোকানে সেলস্‌ম্যান হিসেবে কাজ করতে শুরু করি এবং প্রতি মাসে বেতন পাই ২০ হাজার টাকা। আমি খুবই গরিব ছিলাম যখন সেখানে কাজ শুরু করি। কোনো সঞ্চয় ছিল না এবং আমার চাকরিদাতার দেওয়া ঋণের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই ঋণ আমি এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করি।

পরিবারের সাহায্যে আমার রেমিটেন্স ব্যবহার করে ২০০৫ সালে কৃষিজমি কিনতে শুরু করেছিলাম। আশা ছিল পরবর্তী কয়েক বছরে সাধ্যানুযায়ী আরও কিছু জমি কিনব। তারপর ২০১১ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং বিদেশে উপার্জিত অর্থ দিয়ে স্থানীয় উপজেলায় এক লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ করে স্থাবর সম্পত্তি কিনি। জমির পরিমাণ ৩ ডেসিমেল। গ্রামে আমি একটা আধা-পাকা বাড়িও করেছি।

বর্তমানে আমার কোনো ঋণ নেই এবং পরিবারের জন্য মোটামুটি সঞ্চয় রয়েছে। আমার অভিবাসন বিভিন্নভাবে পরিবারকে সাহায্য করেছে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকৃত অর্থেই সফল হয়েছি। এখন দেশে প্রতি মাসে ২৮ হাজার টাকা উপার্জন করি। আমার আর বিদেশ যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নাই। বহুদিন কঠোর পরিশ্রম করেছি। এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই।

সম্পদ মূল্যহীন যদি তা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি না করা যায়

আবু সাদেক বাবু

আমি আবু সাদেক বাবু। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীতে বসবাস করছি ২০০৯ সাল থেকে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারাতে আমার জন্ম ১৯৮৫ সালে। ওখানেই বসবাস করেছি ২০০০ সালে চট্টগ্রামের পীরখানায় না আসা পর্যন্ত। আমি বিবাহিত, কিন্তু আমার কোনো সন্তান

নাই। আমার মা মারা যায় ২০০৭ সালে এবং বাবা ছিল বেকার। আমার দুই ভাই সাদেক এবং শাহীন। তারা বাবার সাথে গ্রামেই থাকে।

আমি ১৯৯০-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেছি। তারপর হীল হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখান থেকেই এসএসসি পাশ করি। এসএসসি পাশের পর চট্টগ্রামে চলে যাই। একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করি। সেখানে কর্মরত অবস্থায় ২০০৯ সালে আবুধাবী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমি একটা 'কোম্পানি ভিসা' পেতে সক্ষম হয়েছিলাম, যা আমাকে অভিবাসনে সাহায্য করে। উন্নততর জীবনযাপনের আশা নিয়ে আবুধাবীতে যাই। আমি মোটামুটি ভাগ্যবান ছিলাম। ওখানে কিছু বন্ধু ও পরিবার জুটেছিল, যাদের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতাম। কাজ করতে শুরু করেছিলাম একটা দৃষ্টিশক্তিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে চশমার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়ার কারিগর হিসেবে। তিন বছর পর কর্মস্থলের কাছাকাছি নিজের থাকার ব্যবস্থা করে নেই। বিদেশ যাওয়ার পর থেকে নিয়মিত দেশে অর্থ পাঠিয়েছি। আমার গ্রামের মসজিদ তৈরিতে কিছু অর্থ সাহায্য করেছি। বিদেশে থাকা অবস্থায় আমি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছি। একবার এসে বিয়ে করি আকিমন সুলতানাকে। পরের বার এসে বাড়িটা সংস্কার করেছি। এছাড়া গরিব আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের শিক্ষা ও বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছি। ভাবতে ভালো লাগে যে এখন আমি অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে পারি।

বৈধ অভিবাসন করে ফেল মেরেছি অনিয়মিত অভিবাসন করে বেশি আয় করেছি

মিরাজ হক

আমি মিরাজ হক। চট্টগ্রামের বোয়ালখালিতে আমার বাড়ি। আমি ১৯৮১ সালে ওমান গিয়েছিলাম এবং সেখানে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে ভবণ নির্মাণ ও রাস্তা মেরামতের কাজ করেছি। এছাড়া খণ্ডকালীন কাজ করেছি মালি ও বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি হিসেবে।

প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম। সময়ের সাথে সেই বেতন বেড়ে দাঁড়ায় মাসে ২০ হাজার টাকায়। আমি ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ওমানে ছিলাম। নিজের জন্য খরচ করেছি সামান্যই। বড় অংকের টাকা পাঠিয়েছি আমার পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য। এক সময় আমি বাড়ি ফিরে আসি। তখন আমার সঞ্চয় ছিল ১০ লাখ টাকা যা দিয়ে আমি ১২০ ডেসিমেল জমি কিনেছিলাম।

কিছুদিন বাংলাদেশে থাকার পর আমি আবার অভিবাসী হয়েছিলাম। গিয়েছিলাম সৌদি আরবে। কাজ পেয়েছিলাম কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বেতন ছিল খুবই কম; মাসে মাত্র চারশ সৌদি রিয়াল। তিন বছর সৌদি আরবে থাকার পর দুবাইয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার কাছে একটা ট্যুরিষ্ট ভিসা ছিল। তাই উপার্জন শুরু করেছিলাম অনিয়মিত উপায়ে। অর্থাৎ সে দেশের নিয়ম না মেনে। আমি সৌদি আরবের চেয়েও বেশি উপার্জন করেছিলাম দুবাইয়ে মাসে প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। দুভাগ্যজনকভাবে, দুই বছর পর কর্তৃপক্ষ

আমাকে গ্রেফতার করে এবং দুবাই থেকে বিতাড়িত হই। দেশে ফিরে আসার পর গবাদি পশু, মাছ ও মুরগীর খামার করেছি।

আমি রাস্তার পাশে দশ কিলোমিটার জায়গা সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেখানে দুই লাখ সেগুনসহ এমন সব গাছের চারা লাগানোর, যা উন্নতমানের কাঠ হিসেবে বিবেচিত। এসব কাঠ হলো আমার করাতকল ও কাঠের ব্যবসার চালিকাশক্তি। এসব ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা আয় হয়। আমার যাবতীয় ব্যবসা ও সম্পদের বর্তমান মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। বর্তমানে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখী জীবনযাপন করছি।

সমৃদ্ধি বেদনার স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে

মোহাম্মদ ইউনুস

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার চৌধুরী পাড়ায় আমার বসবাস। বয়স হওয়ার পর জানলাম যে, পরিবার আমার কাছে অনেক কিছু আশা করে। এমনকি আত্মীয়-স্বজনরা আশা করে যে তাদেরকেও সহযোগিতা করব। আমার কোনো ধারণা ছিল না কিভাবে তা সম্ভব। কারণ আমার না ছিল শিক্ষা না ছিল সম্পদ। ফলে মারাত্মক সামাজিক ও মানসিক চাপের ভেতর দিন কাটাতে লাগলাম।

এক সময় এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশ যাওয়ার। জানতাম বহু লোক বিদেশ গিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন করেছে। তাদের অবস্থা দেখে আমিও উৎসাহিত হলাম। প্রথমে গেলাম ওমান। তারপর দুবাই। সর্বমোট ২২ বছর কাটালাম বিদেশে। এটা ছিল জীবনের এমন একটা সময় যখন মানুষ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে থাকতে চায় কিন্তু সে সময় আমি বিদেশে কাজ করেছি। প্রায়ই আমার বাড়ির জন্য মন খারপ হতো। মোটা অঙ্কের টাকা সঞ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়িতে আসতে পারি নাই।

আমি প্রথমে গিয়েছিলাম ওমানে। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল ৮০ হাজার টাকা। চাকরি পেলাম একটা কোম্পানিতে, গাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করে। একই কোম্পানির হয়ে দুবাইতেও কাজ করেছি। শুরুতে আমার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। ফলে চাকরির প্রথম কয়েক মাস কাজটা ছিল খুবই কঠিন। দিনে দিনে এই পেশায় আমি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি এবং আয় করেছি প্রচুর অর্থ এবং রেমিটেন্সও পাঠিয়েছি অনেক।

বাংলাদেশে ফিরে আসার পর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে শুরু করেছি ব্যবসা। সীতাকুণ্ড কলেজ সংলগ্ন এলাকায় একটা বাড়ি করেছি; প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা ভাড়া আসে। গাড়ি ভাড়া দেওয়ার একটা ব্যবসাও চালু করেছি আমার গ্রামে। বিদেশে যে কোম্পানিতে কাজ করেছিলাম ঠিক তাদের মতো করে। সীতাকুণ্ড বাজারে আমার কয়েকটি দোকান আছে। দোকানগুলো থেকে অনেক টাকা ভাড়া আসে। আমার ব্যবসায় কয়েকজন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। যখন পেছনে তাকাই, মনে পড়ে যৌবনের সেই দিনগুলি, যা ছিল বেদনা ও দুর্ভোগে পরিপূর্ণ। তবে আমার বর্তমান সমৃদ্ধি সেই সব বেদনার স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে।

রামরু'র বদৌলতে আমি আজ দক্ষ অভিবাসী

ময়না বেগম

বরিশাল জেলার ছোট আমতলা গ্রামে আমার বসবাস। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত জন। দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে সবসময় অনুভব করতাম- আমার অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

আমি ২০০৯ সালে দুবাই যাওয়ার জন্য টাকা যোগাড় করলাম, যেন পরিবারের জন্য রোজগারের কাজটা শুরু করতে পারি। মিরপুর ট্রেনিং সেন্টার থেকে আরবি ভাষাশিক্ষা কোর্স শেষ করলাম এবং প্রস্তুতি নিয়েছিলাম দুবাই যাওয়ার। দুবাই গিয়ে যে কাজ শুরু করি তা ছিল খুবই কঠিন। ভাষা জানা থাকায় সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম, অধিক সমস্যা তৈরি হওয়ার আগেই। আমার চাকরিদাতা ছিল খুবই ভালো মানুষ এবং খাবারের ব্যাপারে আমি কোনো সমস্যার মুখোমুখি হই নাই।

চার বছর কাজ করার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং দেশে ফিরে আসি। দেশে আসার পর দিনে দিনে সুস্থ হয়ে উঠি এবং আরও একবার বিদেশ যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকি। এমন সময় রামরু'র সাথে পরিচয় হয় এবং তারা আমাকে সাহায্য করে গ্রীনল্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। গ্রীনল্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে দুবাই এর দুজন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং সেখানে চাকরির জন্য আমি ইন্টারভিউ দেই। এই ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে দুবাই এর একটা স্কুলে পরিচারক পদে আমার চাকরি হয়ে যায়। পেয়ে যাই আমি আমার স্বপ্ন পূরণের সিঁড়ি। আমার ধারণা রামরু'র মতো আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা আমার মতো অভিবাসীদের পছন্দমতো চাকরি খুঁজে নিতে সাহায্য করে থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের আরও সম্মান দেখানো উচিত।

আমার সুখের দিনে আমি কী করে গনি মিয়াকে ভুলে যাই

কামাল খান

আমার বয়স আটাশ বছর এবং আমার স্ত্রী ও চার বছর বয়সী একটা কন্যাসন্তান আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আকৈশোরা গ্রামে আমাদের বসবাস। সাত বছর আগে নিজের পছন্দমত বিয়ে করেছি। বাবা তা মেনে নেয় নাই এবং আমাকে ত্যাজ্য করেছে। এ অবস্থায় দিন মজুরের কাজ করতে শুরু করেছিলাম।

আমার কিছু বন্ধু বিদেশে কাজ করতে গিয়েছিল। তারা যে পরিমাণ আয় করত তা ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তখন ভাবতাম আমিও যদি ওদের মতো বিদেশ গিয়ে কাজ করতে পারতাম! আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং সে রাজি হলো কিন্তু আমরা দুজনেই জানতাম বিদেশ যাওয়ার মতো অর্থ আমাদের নেই। তারপর আমি আমার শ্বশুরকে বললাম আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য। তিনি আমাকে কিছু টাকা দিলেন কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না। তখন বেপরোয়া হয়ে আমার বাবার কাছে গেলাম। বাবা বললেন - কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।

তখনও জানতাম না কী করণীয়। একটাই উপায় মহাজনের কাছে ঋণ নেওয়া। শেষ পর্যন্ত তাই করতে হলো। অবশেষে দুবাই যাত্রা করলাম। কিন্তু ভিসার জটিলতার কারণে ফ্লাইট ধরতে পারলাম না। তিন মাস পর আবার দুবাই যাওয়ার চেষ্টা করলাম এবং একই কারণে আবার ব্যর্থ হলাম। এটা ছিল ২০১০ সাল। লোকে বলত আমি দুর্ভাগা, আমি কখনই বিদেশ যেতে পারব না। এসব ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়লাম। তাছাড়া মহাজনের কাছে আমি ভীষনভাবে ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়ি।

ভিসার ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান নাও হতে পারি, কিন্তু আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান গ্রামের একজন প্রতিবেশীকে পেয়ে। যে প্রকৃতই এজন হৃদয়বান ব্যক্তি। আমার দুর্ভোগ দেখে প্রতিবেশী গনি মিয়া আমাকে কিছু অর্থ ধার দেয় এবং আমি অন্য এক দালাল সন্ধান করে তৃতীয় বার অভিবাসনের উদ্যোগ নেই। প্রাথমিকভাবে দালাল অল্পকিছু টাকা নেয় এবং বাকি টাকা চাকরি পাওয়ার পর নেওয়ার শর্তে রাজি হয়। এবারের অভিবাসন সফল হয় এবং আমি শেষ পর্যন্ত দুবাই পৌঁছাই। অভিবাসনের শেষ উদ্যোগে খরচ হয়েছিল দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা। এটা ছিল একটা আর্থিক ঝুঁকি এবং অভিবাসনে এ ধরনের ঝুঁকি থেকেই যায়।

প্রথম দিকে আমার মাসিক উপার্জন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এক বছর পর আমার উপার্জন বেড়ে যায়। বর্তমানে আমার উপার্জন প্রতি মাসে ৬০ হাজার টাকা। আমার সব ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি এবং এখন পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো। ব্যাংকেও এখন কিছু সঞ্চয় আছে। আমরা এখন সুখী। আমি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি কিন্তু আমি চাই আমার মেয়ে আমার চেয়েও অনেক বেশি লেখাপড়া শিখবে। যতদূর সে পড়তে চায় আমি তাকে পড়াব। আমি একটা নতুন বাড়িও কিনতে চাই সেই সঙ্গে কিনতে চাই কিছু কৃষিজমি।

গনি মিয়াকে আমি কোনোদিন ভুলব না। তার সাহায্য না পেলে কোনোদিন আমার পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না কোনোকিছুই। সবসময় তাকে স্মরণ করব এবং চেষ্টা করব তাকে সাহায্য করতে। কারণ তার দয়া আমার জীবনের যাবতীয় সাফল্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

জীবনে প্রথম স্বচ্ছলতার দেখা পেলাম

রূপা বেগম

লক্ষ্মীপুর জেলার কেওড়াডুগি গ্রামের বাসিন্দা আমি। বয়স ৪৮ বছর। আমার ২০ বছর বয়সী ছেলে আব্দুল রহমান দুবাই গিয়েছিল কাজের উদ্দেশ্যে। আমার মেয়ে হালিমার বয়স ২২ বছর। সে বিবাহিতা স্বামীর সাথে থাকে। বর্তমানে আমার দুই সন্তানের অবস্থাই ভালো এবং তাদের কোনো অভাব-অনটন নেই। কিন্তু আব্দুল রহমান বিদেশ যাওয়ার আগে আমাদের অবস্থা ছিল অন্যরকম। আমার ছেলে এবং মেয়ের বয়স যখন দশ এবং বারো, তখন স্বামী আরেকটা বিয়ে করে। তখন আমার মানসিক অবস্থা স্বভাবতই ভালো ছিল না। আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা থাকি। টাকার অভাবে আব্দুল তখন আর লেখাপড়া করতে পারেনি। সে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিল। দিনমজুর হিসেবে অল্প বয়সে অন্যের কৃষিজমিতে কাজ শুরু করে। আমি

কিছু হস্তশিল্পের কাজ করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু এই ধরনের কাজ থেকে উপার্জিত অর্থের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। ফলে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম হালিমার ব্যাপারে। বিশেষ করে যখন তার বিয়ের বয়স হবে তখন টাকা কোথায় পাব।

একদিন আমার বড় ভাই আমার বাড়িতে বেড়াতে আসে। আমার পরিবার যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে তা আলোচনা করতে গিয়ে ভাই পরামর্শ দেয় আব্দুলকে কাজের উদ্দেশ্যে দুবাই পাঠিয়ে দিলে সে পরিবারকে সাহায্য করতে পারবে। প্রথমে আমি রাজি হই নাই। পরবর্তীতে আমার ছেলে এ ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ দেখায় এবং শেষ পর্যন্ত সে আমাকে রাজি করায়। আমার ভাইয়ের দেওয়া অর্থসাহায্য এবং কিছু ঋণ করে ২০১২ সালে আব্দুল দুবাই চলে যায়।

বর্তমানে আব্দুল প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা আয় করে এবং মাসে সাত হাজার টাকা বাড়িতে পাঠায়। সে ২০১৩ সালে তার বোনের বিয়েতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও বোনের বা তার পরিবারে কোনো কিছু দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে সেসব চাহিদা মেটায়। আব্দুলের সাফল্য ও সাহসিকতায় আমি সত্যিই খুব সুখী। আমি তার ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই আশাবাদী। বর্তমানে আব্দুল তার ঋণ ধীরে ধীরে পরিশোধ করছে। সে স্বপ্ন দেখে আমাকে একটা নতুন বাড়ি করে দেওয়ার এবং আরও আশা করে তার ভগ্নিপতি কোনো একদিন দুবাই গিয়ে তার মতো কাজ করে অর্থ উপার্জন করবে।

কোরআন পড়তে শিখেছি, এই তৃপ্তি আমি রাখবো কোথায়!

সুলতানা

আমি চাঁদপুর জেলার মতলব গ্রামের বাসিন্দা। আমার স্বামী স্থানীয় এক দালালের মাধ্যমে বিদেশ যেতে চেয়েছিল। সে দুবাই যাওয়ার জন্য দালালকে দিয়েছিল ৯০ হাজার টাকা। কিন্তু সে প্রতারণার শিকার হয়। একটা জাল পাসপোর্ট নিয়ে সে দুবাই গিয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে সে দুবাই থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। এই অভিজ্ঞাতার পরও সে বিদেশ যেতে চায়। অন্য এক দালালের মাধ্যমে সে চেষ্টা করতে থাকে। দালাল আমার স্বামীকে জানায় যে মেয়েদের অভিবাসনের খরচ পুরুষের প্রায় অর্ধেক। তখন আমার স্বামী তার পরিবর্তে আমাকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। স্বপ্ন ছিল যদি সবকিছু ভালোভাবে ঘটে তাহলে আমি আমার স্বামীকে বিদেশ নিয়ে যেতে পারব।

আমি দুবাই গিয়েছিলাম ১৯৯৪ সালে। খরচ হয়েছিল ৩১ হাজার টাকা এবং তা বহন করেছিল আমার পরিবার। সৌভাগ্যক্রমে চাকরিদাতা আমার প্রতি খুবই সদয় ছিল এবং আমাকে তার পরিবারের সদস্য বলে মনে করত। আমার কাজ ছিল পরিবারের চারটি সন্তান এবং তাদের বৃদ্ধ পিতামহের পরিচর্যা করা। প্রথম দিকে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে আমাকে খুবই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাষা। আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি ঘটে। এছাড়া যখন তারা জানল আমি মুসলমান কিন্তু কোরআন পড়তে পারি না তখন চাকরিদাতা আমাকে আরবি

শিখতে সাহায্য করে যেন আমি পবিত্র গ্রন্থটি পড়তে পারি। মুসলমান হয়ে জন্মেছিলাম, কিন্তু দেশে কোরআন পড়াটাও শেখায়নি কেউ। আমার চাকরিদাতা আমাকে কোরআন শেখান। এই তৃপ্তি আমি রাখবো কই?

প্রতি মাসে আমি ৫ হাজার টাকা আয় করতাম। প্রথম দিকে জানতাম না কিভাবে দেশে টাকা পাঠাতে হয়। চাকরিদাতার স্ত্রী আমাকে শিখেয়েছিল ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে রেমিটেন্স পাঠাতে। সে আমাকে আরও শিখিয়েছিল কিভাবে 'ভয়েস মেসেজ' রেকর্ড করে পরিবারের কাছে পাঠানো যায়। শেষ পযর্ন্ত আমার স্বামীকে বিদেশ নিতে পারি নাই। দুবাইয়ে পাঁচ বছর কাজ করার পর দেশে ফিরে এসেছি। বিদেশ থাকাকালীন সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়েছি সন্তানদের সঙ্গ থেকে। আরও একটা বেদনার বিষয় হলো বিদেশে থাকা অবস্থায় আমার মা মারা যায়। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আমাদের বসতবাড়ি আরও সম্প্রসারণ করেছি। আমার জীবনে এখন আর কোনো আফসোস নাই।

মন টেকে নাই, ফিরে আসি আবারও যাব

নূর মোহাম্মদ শাহীন

আমার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার ফুলগাছিপাড়া গ্রামে। মামার সহযোগিতায় ২০১২ সালে দুবাই গিয়েছিলাম কাজের উদ্দেশ্যে। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল দুই লাখ ৩০ হাজার টাকা। এই টাকা যোগাড় করতে সাহায্য করেছিল আমার পরিবার, তবে ৫০ হাজার টাকা ঋণ করেছিলাম এক বন্ধুর কাছ থেকে। দুবাইতে মামার একটা দোকান ছিল এবং সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দুবাই গেলে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার। সুতরাং দুবাই পৌঁছে মামার দোকানে কাজ করতে শুরু করলাম। এ সময় হঠাৎ করে মা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে পরপর দুবার তার হার্ট এ্যাটাক করে এবং সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। আমার মন ছুটে যায় মাকে দেখার জন্য। আমার পরিবারের জন্য এটা ছিল একটা কঠিন সময়। ফলে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আমরা পুরো পরিবার এক সঙ্গে বসবাস করি। পরিবারটা মোটামুটি বড়; বাবা, মা এবং পাঁচ সন্তান। কিন্তু আমাদের কৃষিজমির পরিমাণ খুবই কম। সেটুকুই চাষাবাদ করতাম। মায়ের শারীরিক উন্নতি হওয়ায় আমি আবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু সে সময় ভিসা পাওয়াটা বেশ কঠিন ছিল। সৌদি আরব তখন বাংলাদেশীদের ভিসা প্রদান করছিল। সুতরাং আমি আবেদন করার কথা ভাবলাম কিন্তু প্রশ্ন হলো - টাকা দিবে কে?

সে সময় আমার কোনো স্থায়ী চাকরি ছিল না। ভাইয়ের সঙ্গে আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম। কিন্তু এই কাজ ভালো লাগত না। আমি অন্য কিছু একটা করতে চাইতাম। এ সময় রামরু পরিচালিত ড্রাইভিং কর্মসূচির কথা জানতে পারি। ড্রাইভিং-এ সবসময়ই আমার আগ্রহ ছিল। তাই ভাবলাম এটা একটা বিশাল সুযোগ। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স আমাকে দক্ষতাসম্পন্ন করে তুলতে পারে এবং খুলে দিতে পারে অন্যান্য সুযোগের দরজা। যদি আবার বিদেশ যেতে পারি

তাহলে সেখানে সহজেই কাজ শুরু করতে পারব ড্রাইভার হিসেবে। আর যদি তা না পারি তাহলে দেশেই ড্রাইভারের কাজ করতে পারব।

দক্ষতা শোষণের সুযোগ কমায়

রহমত হোসেন

আমি চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা। উনিশ বছর বয়সে ২০০৮ সালে আমার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় আমি দুবাই গিয়েছিলাম। খরচ হয়েছিল দুই লাখ টাকা। এই অর্থ আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার করেছিলাম। অভিবাসনের আগে আমার আত্মীয় বলেছিল যে দুবাই গিয়ে আমি একটা দোকানে কাজ করব। দুবাই পৌঁছানোর পর আমি কাজ পেলাম একটা বাগানে। বেতন প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা। চাকরিদাতা আমার খাবার খরচ বহন করত। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা ছিল নিজের। নিজের খরচ চালিয়ে প্রতি মাসে দেশে টাকা পাঠাতে পারতাম না। মাঝে মাঝে পাঠাতাম। কখনও ২০ হাজার টাকা আবার কখনও পাঠাতাম ৪০ হাজার। এই টাকা থেকে ঋণ পরিশোধ করা হতো। বাগানের কাজ ছিল খুবই কষ্টকর এবং বেতন দোকানের তুলনায় কম। এ কারণে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হই। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম বিদেশ গিয়ে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাব। কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি।

আমরা চার ভাই। আমার নিজের সামান্য কিছু জমি আছে এবং বাবা সেই জমি চাষাবাদ করতেন। সম্প্রতি বাবা মারা গেছেন। আমি ড্রাইভিং শিখতে আগ্রহী কারণ আমি আবার বিদেশ যেতে চাই। আমি জানি বিদেশে ড্রাইভারের চাহিদা আছে। আমি আরও জানি ড্রাইভিং শেখা মোটেও কোনো সহজ কাজ নয়। রামরু'র ড্রাইভিং কর্মসূচির মাধ্যমে একটা সুযোগ পেয়েছি শেখার। ফলে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শিখছি। কারণ মামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কুয়েতে আমাকে একটা ড্রাইভারের চাকরি যোগাড় করে দিবে। সে একটা ভিসাও পাঠিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আমি কুয়েতে যাব। খরচ হবে দুই লাখ টাকা। এখন সেই অপেক্ষাতেই আছি।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যান্য আরব দেশগুলিতে অভিবাসন

আলজেরিয়া

দালাল ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছে

মোহাম্মদ তাজুল হক

আমি টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার কাগমারা গ্রামের বাসিন্দা। আমার বাবা একজন নির্মাণ শ্রমিক। দুই ছেলে ও তিন মেয়েকে লালনপালন করতে গিয়ে পরিবারের যাবতীয় চাহিদা মেটানো তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য আমার বাবা ২০১৪ সালের মার্চ মাসে আমাকে আলজেরিয়া পাঠিয়েছিল। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল এক লাখ ৭৫ হাজার টাকা। চুক্তি অনুযায়ী বেতন দেওয়ার কথা ছিল প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু মাস গেলেও বেতন হাতে পাই না। দুই মাস বেতন ছাড়া কাজ করার পর যে কোম্পনিতে কাজ করতাম তারা আমাকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে ফিরে আসার পর দালালের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। দালাল কেবলই আমাকে সান্তনা দেয় এবং প্রতিজ্ঞা করে অন্য কোনো দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। ইতিমধ্যে দুই বছর পার হয়ে যায়। অবশেষে আমি গালা-তে আয়োজিত অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির এক সভায় যোগ দেই এবং জানতে পারি আলজেরিয়াতে গিয়ে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের একটা সম্ভাবনা আছে। কমিটির পরামর্শ অনুয়ায়ী এবং বেসরকারি সংস্থা আরপিডিও-র সহায়তায় ২০১৫ সালের ২৩ আগষ্ট বিএমইটি বরাবর অনলাইনে একটা নিয়মানুগ ও যথাযথ মামলা দায়ের করি। এরপর ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর ৯০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়ে যাই। অন্যায়কে পরাভূত করার জন্য অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটির কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

জর্ডান

সীমানার কাঁটাতার পেরিয়ে বন্ধুত্ব

ডলি বেগম

কয়েক বছর আগে আমি ঢাকার একটা গার্মেন্টস ফ্যক্টরিতে কাজ করতাম। কোনরকমে দিন পার হচ্ছিল। সেই সময় দেখতে পেলাম আমার কিছু সহকর্মী জর্ডানে পোশাক শিল্পে কাজ করতে যাচ্ছে। আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম তাদের সঙ্গে জর্ডানে গিয়ে কাজ করার।

আমার পরিবারে আমিই ছিলাম একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমি ও ছোট দুই বোনসহ আমার মাকে পরিত্যাগ করেছিল আমার বাবা। তখন আমাদের লালনপালন করতে গিয়ে মাকে একাই ভয়ানক কষ্ট করতে হয়েছে। আর্থিক কারণে ষষ্ঠ শ্রেনিতেই আমাকে স্কুল থেকে ঝরে পড়তে হয়। দুই বছর অলসভাবে ঘরে বসে থাকার পর এক খালার সাথে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরে আসি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য ।

মাকে আমি আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চাইতাম। চাইতাম আমার অন্য দুই বোন যেন লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে। উপার্জন আরও বাড়াতে জর্ডান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। জর্ডানে আমার অবস্থান খুবই ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। চমৎকার কাজের পরিবেশ এবং অপেক্ষাকৃত রুচিসম্মত থাকার ব্যবস্থা খুবই উপভোগ করেছিলাম। আমার কোম্পানি বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নারী সহকর্মীদের সঙ্গে একটা মেসে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। সহকর্মীদের কাছ থেকে তাদের দেশ সম্পর্কে জেনেছিলাম অনেক কিছু। এক সহকর্মীর কাছ থেকে শ্রীলংকার খাবারও রান্না করতে শিখেছি। এমনকি কিছু হিন্দি কথাবার্তাও শিখেছিলাম। কর্মক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই হিন্দি বলতাম।

সাত বছর জর্ডানে থাকার পর ২০১৩ সালে দেশে ফিরে আসি। আমি গভীরভাবে পরিতৃপ্ত। কারণ পরিবারের বড় মেয়ে হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। সক্ষম হয়েছি দুই বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বাড়িতে এখন আমি এবং আমার মা বসবাস করছি। আমার বয়স এখন ২৮ বছর এবং আশা করছি অল্পদিনের মধ্যে বিয়ে করব।

অযোগ্য স্বামীর কথা রাখার চেয়ে সন্তানের উন্নতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ - বিয়ে থাকুক বা না থাকুক

মোমেনা

আমার নাম মোমেনা। বাড়ি টাঙ্গাইল জেলায়। বয়স ৪৫ বছর এবং বর্তমানে আমি জর্ডানে কাজ করছি। একদিন হঠাৎ করে আমার স্বামী মারা যায়। ফলে আমাকে খুব কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়। এ সময় আমি সেলাইয়ের কাজ করতে শুরু করেছিলাম। পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যরা স্বামীর ছোট ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে দেয়, যে ছিল তখন বেকার। সেলাইয়ের কাজই ছিল তখন আমার একমাত্র আয়ের উৎস। এত অল্প টাকায় সন্তানদের নিয়ে জীবনযাপন

করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। এসব পরিস্থিতি আমাকে অভিবাসনের কথা চিন্তা করতে প্রভাবিত করে। ফলে কিছু এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করি যেমন - বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস লিমিটেড, বোয়েসেল। দশ বছর আগে আমি জর্ডানে কাজ করতে গিয়েছিলাম এবং যাওয়ার আগে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। বিদেশ যাওয়ার কয়েক বছর পর আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে দেশে ফিরে আসতে বলে এবং না এলে তালাক দেওয়ার হুমকি দেয়। আমি চাই নাই আমার স্বামী আমাকে তালাক দিক, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশেও ফিরে আসি নাই। কারণ অযোগ্য স্বামীকে খুশি করতে দেশে ফেরার চেয়ে সন্তানের উন্নত জীবন তৈরি আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ে টিকুক বা না টিকুক। ফলে স্বামী আমাকে তালাক দেয়। বর্তমানে আমি আমার বাবার নামে রেমিটেন্স পাঠাই। এই অর্থ দিয়ে বাবা, মা, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী আমার সন্তানদের দেখাশোনা করছে এবং তারাও ভালো আছে।

আমার যৌতুক আমিই যোগাড় করি

জান্নাত আরা

লেখাপড়ায় আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। ফলে পরিবারের লোকেরা আমাকে বিয়ে দেওয়ার খুবই চেষ্টা করে। আমি ঢাকার একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তিন বছর কাজ করেছি কিন্তু বিয়ে হয় নাই। কারণ যৌতুকের দাবি এবং তার পরিমাণ এতটাই বেশি ছিল, যা পূরণ করা আমার পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারপর সিদ্ধান্ত নেই বিয়ে না করার এবং বড় বোনের মতো বিদেশ যাওয়ার। আমি বাংলাদেশে ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস লিমিটেড এর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং জর্ডানে অভিবাসী হই। সেখানে বর্তমানে একটা গার্মেন্টস ফ্যক্টরিতে কাজ করছি এবং প্রতি মাসে উপার্জন করছি ২৬ হাজার টাকা। আমি বেতনের একটা অংশ নিয়মিত দেশে পাঠাই। আমার বাবা এবং ভাই সে টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করছে। তারা কিছু টাকা আলাদা করে জমিয়ে রাখছে আমার বিয়ের খরচের জন্য। আমি ২০১৫ সালে দুমাসের জন্য দেশে এসেছিলাম। সে সময় আমার বিয়ের অসংখ্য প্রস্তাব আসে। অবশেষে বিয়ে করেছি। আমার স্বামীও আমার মতো বিদেশ যেতে চায়। হয়তো কোনো একদিন তাকে আমি জর্ডানে নিয়ে যেতে পারব। আমার রেমিটেন্স থেকে ৪০ হাজার টাকা আমি সঞ্চয় করেছি। এটা হলো স্বামীর অভিবাসনের খরচ, যদি সে সুযোগ পায়। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সে দেশেই একটা ব্যবসা শুরু করবে। আমার অভিবাসনের উদ্দেশ্য ছিল বিয়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা এবং সেক্ষেত্রে আমি সফল হয়েছি।

তারা আমার চুক্তি বদলে ফেলে

পাপড়ি খাতুন

আমি ফরিদপুর জেলার বাখুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে বাবা আমাকে জর্ডানে পাঠিয়ে দেয় অর্থ উপার্জনের জন্য। আমি ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সংসারের কাজকর্ম রক্ষণাবেক্ষণের

ওপর প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর আমি জর্ডানে চলে যাই। আমি প্রথমে আমার চাকরিদাতা, যার সাথে আমার চুক্তিপত্র হয়েছিল তার বাড়ি গিয়েছিলাম। তার নাম ইউসুফ মো: আবদুল্লাহ হাম্মাদ। আমার ও স্পনসর এর মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল সে অনুসারে আমার বেতন পাওয়ার কথা প্রতি মাসে একশ ৭৫ ইউএস ডলার। কিন্তু জর্ডানে এসে দেখলাম তা ঠিক নয়। তারা আমার সঙ্গে নতুন একটা চুক্তি করল এবং সেখানে দেখা গেল বেতন অনেক কম। শুধু তাই না, আমার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলিও মেটানো হতো না, যেমন পোশাক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত দ্রব্যাদি। চাকরিদাতা আমাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত। এ অবস্থায় আমি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং বাবা আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। আমার বাবা তখন রামরু'র সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য। রামরু আমার বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর ২০১৩ সালের ১৮ জুন বিএমইটি অফিসে আমার কাগজপত্র ও প্রমাণাদি পাঠিয়ে দেয়। আমার প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য আমার বাবা একটা আবেদনপত্রও জমা দেয়। কয়েকবার যোগাযোগ করে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার পর বিএমইটি শেষ পর্যন্ত সাহায্য করতে সক্ষম হয় এবং ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। আমার বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনার জন্য বিএমইটি এবং রামরু'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেকেই বিদেশ যায় এবং সফল হয় কিন্তু আমিই কেবল দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছি।

আমি যা হারিয়েছি তা জীবনে ফিরে পাবার নয়

ঝুমা খাতুন

ফরিদপুর জেলার সুলতানপুর গ্রামে আমার বসবাস। ২০১৩ সালের ১২ জুলাই গৃহকর্মী হিসেবে জর্ডান গিয়েছিলাম। আমি কয়েকজন লোকের সহযোগিতায় অভিবাসী হয়েছিলাম তারা হলো, স্থানীয় দালাল ইসহাক সরদার, তার ভাই ছাবু সরদার এবং ভদ্রাসন উপজেলার চেয়ারম্যানের ছেলে শাওন। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল ৬০ হাজার টাকা। জর্ডানে যাওয়ার আগে শেখ ফজিলাতুন্নেছা কারিগরি ট্রেনিং সেন্টারে একুশ দিনের একটা গৃহকর্মীর প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছিলাম। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পর ছিল আমার জর্ডানের ফ্লাইট। বিমানবন্দরে প্রবেশের পূর্বে চেয়ারম্যানের ছেলে আমাকে একটা প্যাকেট দিয়ে বলেছিল জর্ডানে পৌঁছানোর পর যে আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিতে আসবে তাকে প্যাকেটটা দিতে হবে। আমার সহযাত্রী এক মেয়ে বললো যে প্যাকেটে ইয়াবা থাকতে পারে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী বিমান বন্দরের টয়লেটে প্যাকেটটা ফেলে দেই। আমি ২০১৩ সালের ১৩ জুলাই জর্ডানে পৌঁছালাম। দালালের এক প্রতিনিধি আমাকে বিমানবন্দর থেকে তাদের কার্যালয়ে নিয়ে যায়। চাকরিদাতার সঙ্গে সেই অফিসেই সাক্ষাৎ ঘটে এবং সে আমাকে তিন হাজার জর্ডানী ডলার (চার হাজার দুশ ইউএস ডলার) দেয়। পরবর্তীতে বলা হয় এই টাকা দিয়ে আমাকে মালিক কিনে নিয়েছে। জুলাই মাসের ১৪ তারিখে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। কখনও কখনও আমার কাজের সময় ছিল সকাল সাতটা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত। আমাকে তারা খেতে দিত প্রতিদিন এক টুকরো রুটি, এক কাপ চা এবং সামান্য ফল। ভাত খেতে দিত সপ্তাহে একদিন। কাজ শুরু করার

পর থেকেই চাকরিদাতার দুই ছেলে মাঝে মাঝে আমাকে শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দিত কিন্তু আমি রাজি হই নাই। ফলে আমাকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একদিন চাকরিদাতার ছোট ছেলে আমাকে ধর্ষণ করে। সেদিন আমি আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি নাই। তারপর থেকে তারা বার বার আমার কাছে আসত এবং ধর্ষণ করত। এক মাস পর আমার বাবাকে টেলিফোনে সবকিছু জানাই। তখন আমার বাবা তা দালালকে জানায় এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে। কিন্তু দালাল কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় আমার বাবা স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করে। চেয়ারম্যান তখন আমার বাবা, দালাল ও শাওনকে নিয়ে সালিশের ব্যবস্থা করে। সালিশে সিদ্ধান্ত হয় দশ দিনের ভিতর আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। সেই দশ দিন সময়ও পেরিয়ে যায় কিন্তু কোনোকিছুই হয় না। এই সুযোগে দালাল ও শাওন গা ঢাকা দেয়। ফলে আমার বাবা মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ অনুযায়ী থানায় একটা মামলা দায়ের করে। কিন্তু পুলিশ মামলাটা গুরুত্বের সাথে নেয় না। তখন আমার বাবা মামলা সম্পর্কে ফরিদপুরের সংসদ সদস্যকে জানালে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। আমার বিমান ভাড়া বাবদ ৪০ হাজার টাকা আমার বাবাকেই বহন করতে হয়। অবশেষে আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকায় দেশে ফিরে আসার পরই আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মানসিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমার এখন কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

আমার ভাগ্যে জোটে একের পর এক খারাপ চাকরিদাতা

শাহানা খাতুন

আমি ফরিদপুর জেলার আলীপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধাও। তিন ভাইবোনের মধ্যে আমি বড়। ১৯৭৮ সালে বাবা হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। আজও আমরা জানিনা তার ভাগ্যে কী ঘটেছে। তখন বহুদিন আমরা অনাহারে থেকেছি। তিন বছর পর মা ফরিদপুর সদর হাসপাতালে নার্সের চাকরি পায়। এসএসসি পাশ করার পর অর্থের অভাবে আর লেখাপড়া চালাতে পারি নি। দুবাইয়ে কর্মরত আমার মামীর মাধ্যমে সেখানে একটা চাকরি পেয়ে যাই। ২৫ হাজার টাকা খরচ করে আমি ১৯৯৬ সালে দুবাই গিয়ে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে চাকরিতে যোগ দেই। কিন্তু ভাষার কারণে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা হওয়ায় দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হই। তারপর ১৯৯৭ সালে আবার চেষ্টা করি বিদেশ যেতে। এবার আমার মামার সহযোগিতায় হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা-কর্মী হিসেবে সৌদি আরবে একটা চাকরি পেয়ে যাই। সেখানে বেতন প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা। দুই বছর পর ১৯৯৯ সালে আমি আরবি শিখে নেই এবং খাবার সরবরাহের কাজও করি মাঝে মাঝে। অবসর সময়ে বাচ্চাদের কাপড়, টুপি ইত্যাদি সেলাই করার পাশাপাশি কাগজের পুতুল তৈরি করেও কিছু অতিরিক্ত অর্থ আয় করতাম। মাকে সাহায্য করার জন্য টাকা পাঠাতাম মাঝে মাঝেই। উপার্জনের কিছু অংশ সঞ্চয় করতাম ব্যাংকে। কিছুদিন পর আমি আমার ভাইকে সৌদিতে নিয়ে যাই। ইতিমধ্যে বহু ধরনের দক্ষতা অর্জন করার পাশাপাশি প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা আয় করতে শুরু করেছি। আমি ২০০২ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং সে

সময় আমার সঞ্চয় ছিল পাঁচ লাখ টাকা।

ফরিদপুর জেলার মধুখালীতে ২০০৩ সালে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর কিছু জমি কিনেছি এবং তিন লাখ টাকা খরচ করে বাড়ি বানিয়েছি। এমন সময় হঠাৎ জানতে পারলাম আমার স্বামী মাদকাশক্ত এবং তা নিয়ে পরিবারে মারাত্মক অশান্তি তৈরি হলো। ২০০৯ সালে আমি স্বামীকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ পাঠালাম আমার সঞ্চিত টাকা দিয়ে। স্বামী কখনও বিদেশ থেকে আমাকে কোনো টাকা পাঠায় নাই। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমার স্বামীর ভাই আমার নির্মাণ করা নতুন বাড়ির জাল দলিল করে তার স্ত্রীর নামে লিখে নিয়েছে এবং আমার নামে মামলা করেছে। বিষয়টা আমার সন্তান ও আমার জন্য জটিল হয়ে পড়েছে।

এরপর ২০১২ সালের মে মাসে জানতে পারলাম বাংলাদেশ সরকার গৃহকর্মীর কাজের জন্য জর্ডানে লোক পাঠাচ্ছে। আমি ফরিদপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে যাই এবং ইন্টারভিউ এর ব্যবস্থা করি। জানা গেল গৃহকর্মীর চাকরির জন্য একুশ দিনের একটা প্রশিক্ষণ কোর্স করতে হবে। আমি তা সম্পন্ন করি। সৌভাগ্যক্রমে ২০১২ সালের ৪ অক্টোবর আমি জর্ডানের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করি। পরদিন আমার চাকরিদাতা আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। অক্টোবরের ৬ তারিখে আমি কাজ করতে শুরু করেছিলাম। একমাস পর চাকরিদাতা আমাকে ব্যাংকে নিয়ে যায় আমার বেতন দেওয়ার জন্য। চাকরির চুক্তিতে বর্ণিত আছে যে, আমি মাসে দুইশ জর্ডানী ডলার পাব। কিন্তু তারা আমাকে মাসে একশ ৫০ জর্ডানী ডলার দিল। আমি এর প্রতিবাদ করলাম। তারপর থেকেই তার আচরণে দয়ার লেশমাত্র থাকল না, শুরু হলো নির্যাতন। আমি আবার বেতন চাইলে তারা দাবি করে আমার একাউন্টে চার মাসের বেতন জমা দেওয়া আছে। কিন্তু একাউন্টে জমাকৃত কোনো টাকাই দেখতে পেলাম না এবং একথা জানালে আবারো নির্যাতনের শিকার হতে হয় আমাকে। তারপরও বারবার বেতন চাইবার পর আমি পুরো বেতন পেয়েছিলাম। তারা আমাকে পর্যাপ্ত খাবার দিত না এবং সিঁড়ির নিচের একটা ঘরে থাকতে দেয় যে ঘরে কোনো জানালা ছিল না। আমাকে প্রতিদিন গোসলও করতে দিত না পানি বেশি খরচ হবে বলে।

পাঁচ মাস পর স্থানীয় দালালের অফিসে অভিযোগ করি কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। তখন আমি রামরু'র সঙ্গে যোগাযোগ করি সাহায্যের জন্য। রামরু আমাকে জর্ডানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দেয়। আমি আবার দালালের অফিসে যোগাযোগ করি কিন্তু কোনো লাভ হয় না। অবশেষে ২০১৩ সালের ২০ মে আরও একবার দালালের অফিসে যাই এবং তারা বলে যদি আমি বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাকে বাংলাদেশী তিন লাখ টাকা দিতে হবে। অন্যথায় দেশে পাঠানো সম্ভব হবে না। মে মাসের ২৩ তারিখে একজন নতুন চাকরিদাতার কাছে দালাল আমাকে গছিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে দুই হাজার জর্ডানী ডলার গ্রহণ করে। এই নতুন চাকরিদাতার এক ছেলে ছিল। সে আমাকে শারীরিকভাবে অপমান করার চেষ্টা করে। আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না। সেই দিনের পর থেকে চেষ্টা করতে থাকি যেন তারা আমাকে দালালের অফিসে ফেরত দিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তারা রাজি হয় এবং আমাকে দালালের অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে সেই প্রথম জর্ডানীয় চাকরিদাতার মুখোমুখি হতে হয়। আমাকে সে আবার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম তিন দিন ভালোই কাটে কিন্তু তারপর আবার তারা আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতে শুরু করে।

নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখে বাংলাদেশ দূতাবাসের এক মহিলা কর্মকতার সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জানায় দ্রুত আমার দেশে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দূতাবাস এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয় না। এদিকে ২৬ আগষ্ট প্রথম চাকরিদাতা আবারও আমাকে শারীরিক নির্যাতন করলে আমি দূতাবাসের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করি। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ তখন আমাকে দালালের অফিসে নিয়ে যায় এবং যত দ্রুত সম্ভব আমাকে দেশে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তারপরও দালাল আমাকে বিশ দিন তাদের অফিসে রাখে এবং অবশেষে ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে ফিরে আসি। বর্তমানে আমি শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

যা চেয়েছি তা পেয়েছি

জেসমিন আক্তার

আমি জেসমিন আক্তার। আমার স্বামী সেলিম মিয়ার কোনো স্থায়ী চাকরি ছিল না। কাজের প্রতি দায়িত্বহীনতার কারণে বেশ কয়েকবার সে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। এরকম অবস্থায় মাঝে মধ্যেই আমাদের পরিবার আর্থিক সমস্যায় পড়ত এবং স্বামী তখন আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিত। একদিন আমার এক প্রতিবেশীর কাছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সম্পর্কে শুনলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে কিছু একটা করব।

আমার অভিবাসনের খরচ দিয়েছিল আমার বাবা। আমার স্বামী ও দুই ছেলে ফিরে গিয়েছিল গ্রামে আমার মা বাবার সাথে বসবাস করতে, যেন আমার মা ও বোনেরা তাদের দেখাশোনা করতে পারে। আমি কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম এবং সেখানে পাঁচ বছর কাজ করেছিলাম একটা দস্তানার ফ্যাক্টরিতে। বেতন ছিল প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা। আমার উপার্জন দিয়ে আমি সন্তানদের প্রাত্যহিক পুষ্টি ও লেখাপড়া নিশ্চিত করতে পেরেছিলাম। বাবাও সাহায্য করেছিল আমাদের পারিবারিক জমিতে একটা টিনের ঘর বানাতে। এখন আমার সন্তানদের একটা নিজস্ব বাড়ি আছে।

আমি ২০০৮ সালে আবার অভিবাসী হয়েছিলাম জর্ডানে। সেখানে একটা গ্যার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। প্রতি মাসে ওভারটাইমসহ উপার্জন করতাম ১৩ থেকে ১৫ হাজার টাকার মতো। আমি চার বছর জর্ডানে ছিলাম। আমার স্বামী কাজকর্ম না করলেও সে একজন ভালো বাবা। ছেলেদের দেখাশোনা ভালোমতো করছে। আমার দুটো ছেলেই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। বড় ছেলে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। দ্বিতীয়বার অভিবাসনের উপার্জন দিয়ে আমাদের গ্রামে আরও কিছু জমি কিনেছি। প্রথমবার দেশে ফিরে হাঁস লালনপালনের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। বর্তমানে বাড়িতে হাঁস লালনপালন করে বিক্রি করছি। আমি পুরোপুরি তৃপ্ত। অভিবাসন আমার পরিবারের মাথার ওপর একটা ছাদ নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। ছেলেরা ভালো লেখাপড়া শিখছে। এর বেশি আর কী প্রয়োজন?

লেবানন

সৌভাগ্যক্রমে আমার চাকরিদাতাও ছিল একজন নারী

রাবেয়া বেগম

টাঙ্গাইল জেলার ভাতকুড়া গ্রামে আমার বসবাস। আমি, আমার স্বামী, এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে আমার পরিবার। স্বামী একজন রিক্সাচালক। একদিন হঠাৎ করে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনিতেই রিক্সা চালিয়ে সে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। আমাদের উপার্জনের আর কোনো পথ ছিল না। অভিবাসনের আগে আমরা খুবই গরিব ছিলাম। আমাদের হাতে অতিরিক্ত কোনো টাকা থাকত না। দেশে অনেক চেষ্টা করেও একটা চাকরি পাই নাই। ফলে বাধ্য হয়েছিলাম বিদেশ যেতে। আমার ৩১ বছর বয়সে ৭০ হাজার টাকা খরচ করে লেবাননে গিয়েছিলাম। তিরিশ হাজার টাকা ঋণ করেছিলাম আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এবং বাকি ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম মহাজনের কাছ থেকে, চড়া সুদে। বিদেশ যাওয়ার আগে টাঙ্গাইলের একটা সরকারি এজেন্সি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। আইন অনুয়ায়ী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক, যারা গৃহকর্মে আগ্রহী, দেশ ছাড়ার আগে তাদেরকে এক মাসের প্রশিক্ষণ নিতে হয়, বাধ্যতামূলকভাবে। এছাড়া আমার ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হয়েছিল এবং আঙুলের ছাপ দিয়েছিলাম।

লেবাননে যাওয়ার পরপরই আমার একটা চাকরি হয়ে যায়। বেতন প্রতি মাসে নয় হাজার টাকা। যে বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ পেলাম সেই বাড়ির মালিক একজন মহিলা। তার স্বামী মারা গেছে এবং সন্তানেরা অন্যত্র বসবাস করে। মহিলা আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করত। ভালো খাবার ও পোশাক দিত। সে আমাকে তার আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খণ্ডকালীন কাজ করার সুযোগ দিয়ে কিছু বাড়তি আয় করতে সাহায্য করত। বিনিময়ে আমিও তাকে খুশি করতে কঠোর পরিশ্রম করতাম। এভাবে অল্প সময়ের ভেতর আমার ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছিলাম। এ অবস্থায় সেখানে কাজ করেছিলাম পাঁচ বছর।

একবার ছুটি নিয়ে আমি দেশে আসি। সঙ্গে আনি সাত লাখ টাকা, যা আমি লেবাননে কাজ করে সঞ্চয় করেছিলাম। এই টাকা দিয়ে চার ডেসিমেল জমি কিনেছি এবং আমার মেয়ের জামাইকে কাতার যাওয়ার খরচ হিসাবে দুই লাখ টাকা দিয়েছি। সে বর্তমানে কাতারে নির্মাণ-শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে এবং বেতন পায় মাসে ২০ হাজার টাকা। লেবাননে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা হলে আমার প্রাক্তন চাকরিদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু সে জানায় ইতিমধ্যে একজন নতুন লোক সে যোগাড় করেছে। আমি এখনও বিদেশ যেতে চাই কাজ করার জন্য। ইতিমধ্যে সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েছি। তারপরও চিন্তায় আছি, সৌদি আরবে গৃহকর্মীদের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে প্রচুর খারাপ কথা শোনার কারণে। সুতরাং এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না সত্যিই যেতে চাই অথবা চাই না!

আমি যেন ছিলাম তাদের কেনা দাসী

সহেলী আক্তার

নরসিংদী জেলার মহিষাশুর গ্রামের বাসিন্দা আমি। বয়স ২০ বছর। দশ সদস্যের এক গরিব পরিবারের বড় সন্তান আমি। বিয়ের ছয় দিনের মধ্যে স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হই। কারণ স্বামী ছিল নেশাসক্ত ও জুয়াড়ি। বিদেশ যাওয়ার আগে আমি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। বেতন ছিল প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে আমাদের কোনোমতে সংসার চলত। গ্রামে থাকা অবস্থায় একদিন এক দালালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে বিদেশে চাকরি পাওয়ার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা জানায়। আমি উৎসাহিত হই এবং যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। অভিবাসনের খরচ যোগাড় করতে চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হই। তারপর ২০১৫ সালে উনিশ বছর বয়সে লেবাননে যাই। এ কাজে দালালকে দিতে হয় ৮০ হাজার টাকা। লেবাননে গিয়ে গৃহকর্মীর কাজ পাই, ছয় সদস্যের এক পরিবারে। দিনের প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই কাজ করতে হতো কিন্তু কোনো বেতন দেওয়া হতো না। বেতনের কথা বললেই বলত, তারা আমাকে প্রচুর টাকা দিয়ে কিনেছে। আমার সঙ্গে এমন আচরণ করত যেন আমি তাদের দাসী। তারা আরও বলত আমি কখনই বেতন পাব না। তখন দালালের সাথে যোগাযোগ করলে সে জানায় যদি আমি প্রচুর পরিশ্রম করে কাজের মাধ্যমে চাকরিদাতাকে খুশি করতে পারি তাহলে বেতন দেওয়া হবে। আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম এবং সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম যতটা আমার পক্ষে সম্ভব। তারপরও বেতন পাই নাই। এভাবে এক বছর কাজ করেছিলাম। বছরের শেষদিকে চাকরিদাতা আমাকে আকামা অফিসে নিয়ে গেল। কারণ আমার কাজের কোনো চুক্তিপত্র ছিল না। তখন আমি বলি আমি কোনো চুক্তি চাই না, দেশে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু দালাল আমাকে দেশে আসার বিষয়ে কোনো সহযোগিতা না করায় শূন্য হাতে দেশে ফিরে এসেছি। লেবাননে থাকাকালীন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার কাঁধে ঋণের বোঝা যা আমি পরিশোধ করতে পারিনি। আমি দেশের গার্মেন্টস কারখানায় কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছি।

আমাদের ছেলেটাই আমাদের একমাত্র ভরসা-অভিবাসন নয়

রুমা বেগম

আমার নাম রুমা বেগম। নেত্রকোনার নয়াদিয়া গ্রামে আমার বসবাস। বয়স আটাশ বছর। স্বামীর নাম মতি মিয়া। সে লেপ-তোষক-বালিশ তৈরির ব্যবসা করে। আমার একটা মাত্র ছেলে, সে কলেজে পড়ে। তার লেখাপড়ার পেছনে অনেক টাকা খরচ হয়। যেমন, কলেজের বেতন, বই কেনা, কোচিং খরচ ইত্যাদি। এতসব খরচ যোগানো আমাদের জন্য খুব কঠিন। তারপরও চাই ছেলেটা লেখাপড়া চালিয়ে যাক। তাই ছেলেকে লেখাপড়ায় সাহায্য করার জন্য আমি বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। অবশেষে ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে গৃহকর্মী হিসেবে লেবাননে যাই। আমার অভিবাসনে খরচ হয়েছিল ৯৩ হাজার টাকা। আমাদের কিছু সম্পদ বিক্রি করে এই টাকা যোগাড় করেছিলাম। যে বাড়িতে চাকরি হয়েছিল সে বাড়ির সদস্য সংখ্যা

তিন জন। চাকরির শুরু থেকেই আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হতো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম যথাযথভাবে আমার দায়িত্ব পালনের কিন্তু তারপরও তারা খুশি হতো না। তারা স্বামী ও স্ত্রী কয়েকবার আমাকে মারধোর করেছে। নয় মাস সেখানে কাজ করেছিলাম কিন্তু কোনো বেতন পাইনি। বেতন চাইলে তারা রাগ করতো। তাছাড়া গৃহস্বামী কয়েকবার মাতাল অবস্থায় আমাকে যৌন হয়রানীর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কখনও সফল হয় নাই। এখনও আমি চাকরিটা করতে চাই এবং চেষ্টা করতে চাই বেতন পাওয়ার। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। আমার স্বামীকে আমার অবস্থা জানালে সে বিএমইটি-র জেলা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে এবং মামলা দায়ের করে আমার চাকরিদাতার বিরুদ্ধে। আমার স্বামী ২০ হাজার টাকা দেয় আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য। আমি ২০১৪ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসি। দেশে আমার কোনো চাকরি নাই। আমার স্বামী এখনও সেই আগের ব্যবসাই করছে। অভাবের ভেতরে এখন দিন কাটাচ্ছি। আমার অভিবাসনের জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এখন একমাত্র ভরসা আমাদের ছেলে। সে লেখাপড়া শেষ করলে একটা ভালো চাকরি পাবে আশা করছি। স্বপ্ন দেখি তখন আমাদের এই দুঃসময়ের ইতি ঘটবে।

কে জিতবে - সন্তানের মায়া না উপার্জনের চাহিদা

আমিনা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কড়িয়ালা ইউনিয়নে আমার বসবাস। গৃহকর্মী হিসেবে লেবাননে কাজ করতে যাওয়ার আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়া অন্য কোথাও থাকিনি। আমাদের পরিবার মোটামুটি ছোট - আমি, আমার স্বামী, আমার শাশুড়ি এবং আমাদের দুটি সন্তান। স্বামী ছিল মূলত একজন বর্গাচাষী। নিজের কোনো জমিজমা নাই। ফলে সে কখনও কখনও অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবেও কাজ করত। মজুরি প্রতিদিন প্রায় ৩০০ টাকা। কিন্তু প্রতিদিন সে কাজ পায় না। ফলে আমাদের মাসিক উপার্জন ছিল পাঁচ হাজার টাকা অথবা তারও কম। এই স্বল্প আয়ে আমাদের মতো ছোট পরিবারের ভরণপোষণও ছিল বেশ কঠিন।

আমাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায় যখন স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। খুবই সামান্য আয় করে সে তখন। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সে সময় ঋণ করি তাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য। ডাক্তার জানায় মস্তিস্কে টিউমার হয়েছে। এর আগে আর কখনও নিজেকে এত অসহায় মনে হয় নাই। ভাবতেই পারছিলাম না তার অপারেশনের জন্য কোথায় টাকা পাবো।

আল্লাহর রহমতে আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে এক লাখ টাকা ঋণ করি এবং স্বামীর অপারেশন সম্পন্ন হয়। অপারেশনের পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও সে কাজ করতে সক্ষম হয় না। পরিবারের যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য বেশি বেশি সাহায্য নেই তখন আত্মীয়-স্বজন ও মহাজনের কাছ থেকে। আমার শাশুড়ি আমার শিশু সন্তানের যত্ন নেয়। ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ ও মানসিক চাপ তখন আমাকে প্রকৃত অর্থেই ক্লান্ত করে তোলে।

একদিন এক দালালের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে সে পরামর্শ দেয় বিদেশ যাওয়ার। আমি ও আমার স্বামী বিষয়টা নিয়ে কয়েক দিন ভাবলাম এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশ যাওয়ার। এরপর আরও এক লাখ টাকা ঋণ করে লেবাননে চলে গেলাম। স্বামী, কন্যা ও তিন বছরের শিশু-পুত্রকে রেখে গেলাম শাশুড়ির তত্ত্বাবধানে।

তিন বছর আমি লেবাননে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেছি। কাজটা ছিল খুবই শ্রমসাধ্য। কারণ, ষোলটা ঘরের রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছাড়াও তিনটি শিশুর পরিচর্যা করতে হতো আমাকে। পরিস্থিতি ছিল খুবই কঠিন। দিনে আমাকে একবার মাত্র খাবার দেওয়া হতো। অন্য সময় দেওয়া হতো ছোট ছোট কয়েক টুকরো রুটি। ফলে আমি অপুষ্টিতে আক্রান্ত হই এবং দুর্বল হয়ে পড়ি। তারপরও মনোযোগ দিয়ে কাজ করেছি। পরিবারের ভরণপোষণের পাশাপাশি পরিশোধ করেছি যাবতীয় ঋণ। আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আমি দেশে ফিরে এসেছি ।

আমার মতো অভিবাসী অনেক নারী আছে যারা কেবলই ভাবছে যে অধিক পরিশ্রম করে তারা পরিবারের জন্য অধিক সুফল বয়ে আনবে। আন্তর্জাতিক অভিবাসী মা অর্থাৎ আমার মতো একজন মা সন্তানের প্রতি সরাসরি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারে না, তারা কেবলই পারে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বেশিবেশি রেমিটেন্স কিংবা উপহার পাঠাতে প্রিয়জনের কাছে। আমার ছেলের বয়স এখন ছয় বছর। আমার স্বামী চায় আমি আবার কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাই। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সন্তানকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকব না। আল্লাহই ভালো জানে কে জিতবে- সন্তানের জন্য আমার ভালোবাসা নাকি পরিবারের প্রয়োজনের জন্য উপার্জন।

আরও বেশি আয় বাড়াতে নিচ্ছি প্রশিক্ষণ

শেফালী

আমি ফরিদপুরের ডিক্রিরচরের অধিবাসী। কাজের উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে ফুপাতো বোনের সাহায্যে লেবাননে গিয়েছিলাম। খরচ হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা এবং টাকাটা আমি ঋণ করেছিলাম। লেবাননে বেতন পেতাম প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা। চাকরিদাতা ভালো মানুষ ছিল। আমার কাজ ছিল তার দুটি সন্তানকে দেখাশোনা করার পাশাপাশি কিছু গৃহকর্ম করা। তিন বছরের বেশি সময় সেখানে কাজ করেছিলাম। খাওয়া-পরার কোনো কষ্ট হয় নাই। এমনকি অসুস্থ হলে পেতাম উপযুক্ত চিকিৎসা। নিয়মিত ন্যাশনাল ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে রেমিটেন্স পাঠাতাম। প্রথমেই উপার্জনের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করি। বাকি টাকা দিয়ে সংসার চলে। লেবাননে থাকাকালীন আমি এক লাখ টাকা সঞ্চয় করেছিলাম। ফরিদপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে গৃহ রক্ষাণাবেক্ষণের ওপর অনুষ্ঠিত এক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছি। আমি আবার লেবাননে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। আশা করছি যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে গেলে প্রথম বারের চেয়ে বেশি উপার্জন করতে পারব।

যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করেছিলাম চাকরিদাতার আস্থা

সোমা আক্তার

আমি ফরিদপুর জেলার খোরসা গ্রামের বাসিন্দা। আমি ২০০৭ সালে ৬৫ হাজার টাকা খরচ করে কাজের উদ্দেশ্যে লেবাননে যাই। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য আমার সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি হয়েছিল। অভিবাসনের খরচ যোগাতে সুদে ঋণ নিয়েছিলাম ৪০ হাজার টাকা এবং বাকি টাকা সংগ্রহ করেছিলাম পরিবার থেকে। প্রতি মাসে আমি বেতন পেতাম ছয় হাজার সাতশ টাকা। দুই বছরের চুক্তি শেষ হওয়ার পর আরও দেড় বছর তা বাড়ানো হয়। এ সময় চাকরিদাতাকে বেতন বাড়ানোর অনুরোধ করলে তা হয় দশ হাজার টাকা। আমার কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতাই তার আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করেছিল। একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। লেবাননে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হই। রেমিটেন্স পাঠাই মায়ের নামে। সেই অর্থ থেকে মা একখন্ড জমি কিনেছে। আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি এবং বর্তমানে গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ওপর আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি যেন একটা ফ্রি-ভিসা নিয়ে আবারও লেবাননে যেতে পারি। সেই সাথে রামরু আয়োজিত এক দিনের প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি। অভিবাসন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি এই প্রশিক্ষণ থেকে। এছাড়া রামরু আমার অভিবাসনের খরচ যোগাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতেও সাহায্য করেছে।

ইজ্জত বাঁচাতে পালালাম ঠিকই কিন্তু চুরির দায়ে জেলে গেলাম

সামিনা বেগম

আমার বয়স একুশ বছর। বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার জন্য ২০০৯ সালে লেবাননে গিয়েছিলাম আমার বোনের সাহায্যে। সে সেখানে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিল। বোন আমাকে সাহায্য করেছিল একটা লেবানীয় পরিবারের কাছ থেকে একটা কাফালা ভিসা নিশ্চিত করতে। ছুটিতে বোন দেশে এসেছিল এবং আমি তার সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম লেবাননের সিনএলফিল শহরে। এ সময় আমার বোন জানায় আমার আসন্ন কাজের প্রকৃতি, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি সম্পর্কে। চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য প্রমাণাদি সম্পর্কে মোটেও সচেতন ছিলাম না আমি। যাইহোক, কাজ করতে শুরু করলাম এবং দেখলাম কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই। সপ্তাহে সাত দিনই কাজ করতে হতো। সাধারণত ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা এবং তা ছিল দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ। যেমন- রান্নাবান্না ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ। আমি কঠোর পরিশ্রম করতাম কিন্তু নিয়মিত বেতন পাই নাই প্রথম কয়েক মাস। দু'মাস পর এক মাসের বেতন পেতাম। মাসের শেষে বেতন চাইলে চাকরিদাতার মেজাজ বিগড়ে যেত এবং প্রায়ই সে আমাকে গালিগালাজ করার পাশাপাশি মারধোরও করত।

অন্যদিকে পরিবারের ছোট ছেলেটার দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হতে লাগলাম। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু তার বাবাকে কিছু বললাম না। এক রাতে ছেলেটা আমার ওপর আকস্মিক যৌন হামলা চালায়। সৌভাগ্যক্রমে, আত্মরক্ষার জন্য আমি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই ঘটনা তার মাকে জানালে সে তা বিশ্বাস করে

না। উপরন্তু আমাকে দোষারোপ করে এবং ভয়ানকভাবে পেটায়। এরপর আমি তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই এবং শহরতলীতে আমার বোনের এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেই, যা সিন এল ফিল শহর থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমি লুকিয়ে থাকার সময় চাকরিদাতা আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অভিযোগ হলো, আমি তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করেছি। পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। ছয় মাস পর একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আমাকে জেল থেকে উদ্ধার করে তাদের আশ্রয়ে নিয়ে যায়। সেখানে বর্তমানে আমি বসবাস করছি। কারিতাসের নার্সরা বলে যে আমি বেশ কিছু ভুল করেছি। যেমন আমি কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে লেবাননে আসি নাই। একইভাবে গৃহস্থালির কাজকর্ম করার ব্যাপারে আমার কোনো প্রশিক্ষণ নাই। এছাড়া লেবাননের আইন সম্পর্কেও আমি কিছু জানিনা, যেখানে আমার মতো একজন কর্মীর পূর্ববর্তী কোনো নোটিশ ছাড়া বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে না জানিয়ে কর্মস্থল পরিত্যাগ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। লেবাননে থাকাকালীন লেবাননস্থ বাংলাদেশী কনস্যুলেট এর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমার এই কাহিনী থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তা হলো অভিবাসীদের সেইসব তথ্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যে দেশে তারা যাচ্ছে সেই দেশের আইনসংক্রান্ত নিয়মনীতি ও সহায়ক কার্যসাধন পদ্ধতিগুলো।

বিএমইটি এর সাহায্য ছাড়া দেশে ফিরতে পারতাম না

বীনা বেগম

মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার বাসিন্দা। স্বামী পরিত্যাগ করার পর আমি আমার মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব একাই পালন করছি। কিন্তু অর্থের অভাব দিনে দিনেই প্রকট হয়ে উঠে। আর কোনো উপায় না দেখে স্থানীয় এক দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং সে আমাকে "জিনান ট্রেডিং এন্ড কনস্ট্রাকশন" নামক এক এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। এজেন্সি তখন আমার জন্য লেবাননে গৃহকর্মীর একটা কাজের ব্যবস্থা করে। অভিবাসনের খরচ বাবদ দিতে হয়েছিল ৬০ হাজার টাকা। আমি লেবাননে গিয়েছিলাম ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। স্বপ্ন দেখতাম লেবাননে যাওয়ার এবং নিজে কিছু একটা করার। কিন্তু খুব বেশি সময় লাগল না অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে। আমি আরবি জানতাম না। ফলে অনেক কিছু কঠিন হয়ে গেল। চাকরিদাতা আমার কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করেছিল। তারা আমাকে পর্যাপ্ত খাবার দিত না। এমনকি বেতনও দিত না সময়মতো। দেখা যেত দুই অথবা তিন মাস বেতন দেয় নাই। কিন্তু বেতন চাইলেই করা হতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম দেশে ফিরে যাব। আমার মেয়ে আসমা বেগম সাহায্য করেছিল আমাকে দেশে ফিরে আসতে। সে রামরু'র সঙ্গে যোগাযোগ করলে রামরু তাকে বিএমইটি-তে জমা দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র পূরণ করতে সাহায্য করে। বিএমইটি তখন আমাকে সাহায্যের প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। রামরু কয়েকবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিএমইটি এর সঙ্গে যোগাযোগ করে। অবশেষে ২০১৩ সালের ২২ ডিসেম্বর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি।

লিবিয়া

প্রথমবার সফল হয়েছি দ্বিতীয়বার হয়েছি প্রতারিত

মোহাম্মদ আকতারুদ্দিন

কুমিল্লা জেলার মুরাদপুর গ্রামে আমার বাড়ি। বিদেশ যাওয়ার আগে ছোট একটা ব্যবসা করতাম কিন্তু সেই ব্যবসার আয় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ব্যবসায় লোকসান হয়। তখন ভালো বেতনের একটা চাকরি করতে চাইতাম যেন বৃদ্ধ বয়সে কাজ করতে না হয় এবং আরামদায়ক হয় জীবনযাপন। এইসব যখন ভাবছিলাম তখন প্রতিবেশীদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তি আমাকে এক দালালের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। দালাল জানায় সে আমাকে লিবিয়াতে প্লাম্বারের একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে। বেতন মাসে ছয়শ ইউএস ডলার। আর এ ব্যবস্থাপনার জন্য তাকে দিতে হবে চার লাখ টাকা। আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করেছিলাম। লিবিয়া যাওয়ার পর দেখলাম দালাল মিথ্যা কথা বলেছিল। আমার জন্য সেখানে কোনো চাকরির ব্যবস্থা করা হয় নাই। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকদিন একটা হোটেলে এবং গ্যারেজে কাজ করি। কিন্তু মাস শেষে চারশ দিনার পারিশ্রমিক পাওয়ার পর দালাল নিয়ে নেয় একশ দিনার। আমার কাছে থাকে তিনশ দিনার যা বাংলাদেশী ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকা। এই সামান্য বেতন দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং মাসের শেষে দেশে পাঠানোর জন্য আমার কাছে কোনো অর্থ থাকে না। লিবিয়ার যে এলাকায় আমি কাজ করতাম সেটা ছিল একটা সংঘর্ষপূর্ণ এলাকা। মাঝেমধ্যেই গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যেত। এছাড়া আমার কোনো বৈধ অনুমতি ছিল না সেদেশে কাজ করার। সুতরাং লুকিয়ে কাজ করতে হতো যেন কর্তৃপক্ষের চোখে না পড়ি। সে কারণে বেশিদিন লিবিয়ায় থাকতে পারি নাই। দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। ফিরে এসে সবকিছু সেই প্রতিবেশীকে খুলে বলি যে আমাকে দালালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাকে আরও জানাই আমি দালালের বিরুদ্ধে একটা মামলা করতে চাই। কারণ সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মামলা করার উদ্যোগ নিতেই সেই দালাল এবং প্রতিবেশী গা ঢাকা দেয়। জানিনা তারা এখন কোথায়। টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু ফোন বন্ধ। লিবিয়াতেই আমার প্রথম অভিবাসন নয়। লিবিয়া যাওয়ার আগে আমি দুবাই গিয়েছিলাম কাজের উদ্দেশ্যে। দুবাইয়ে উপার্জিত সঞ্চয় দিয়ে দেশে একটা ব্যবসা শুরু করতে পেরেছিলাম। সেখান থেকে এখন প্রতি মাসে আয় করছি আট থেকে ১০ হাজার টাকা। যাইহোক, আমাকেই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে কিন্তু সত্যিকার অর্থে তা কঠিন। আমার গ্রামের অনেকেই কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়ে সফল হয়েছে কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। প্রতারিত হয়েছি বিভিন্নভাবে এবং দিন কাটিয়েছি বঞ্চনার ভেতরে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর বিদেশ যাব না।

ক্ষতিপূরণ চাই না চাই কাজ

মোহাম্মদ হেলাল

আমার বয়স ৩৪ বছর এবং পটুয়াখালির বাসিন্দা। একদিন হঠাৎ করেই কাজের উদ্দেশ্যে লিবিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার ঠিক দশ মাস আগে আমি সেখানে পৌঁছেছিলাম। লিবিয়া যেতে খরচ হয়েছিল দুই লাখ ৭৫ হাজার টাকা। বিভিন্ন উৎস থেকে এই টাকা আমি ঋণ করেছিলাম। অভিবাসনের এই অর্থ যোগাড়ের জন্য আমি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। পরিবারের সামর্থ্য ছিল অল্প কিছু সাহায্য করার। তাছাড়া আমার কোনো আত্মীয় ছিল না যার কাছ থেকে ঋণ করতে পারি। পরিবারিক কোনো জমিও ছিল না যে বিক্রি করবো। ফলে তিন মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বেশি অংশটা ঋণ করেছিলাম। দুজনের প্রত্যেকের কাছ থেকে নিয়েছিলাম ৫০ হাজার টাকা। এর জন্য প্রত্যেক মহাজনকে বছরে সুদ দিতে হবে ৩৭ হাজার টাকা এবং ৪০ মণ ধান। আরও ২৫ হাজার টাকা ঋণ করেছিলাম এক বছরের জন্য, একই হারে সুদ দেওয়ার শর্তে অন্য এক মহাজনের কাছ থেকে। লিবিয়ায় আমার উপার্জন থেকে অর্ধেক ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছিলাম। যদি সেখানে চার-পাঁচ বছর থাকতে পারতাম তাহলে মোটামুটি ভালো সঞ্চয় হতো। যাহোক, অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতি ঘটার কারণে এবং আমার জীবন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এক রাতে আমি এবং আমার সহকর্মীরা রাতের খাবার খেতে বসেছি এমন সময় মিলিশিয়া বাহিনী আমাদের ঘরের বাইরে ব্রাশ ফায়ার করতে শুরু করে। আমরা তৎক্ষণাৎ খাবার ফেলে উঠে পড়ি। কয়েক জনের গায়ে আগুন ধরে যায় এবং মেঝেতে গড়াগড়ি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। তারপর চেষ্টা করতে থাকি দেশে ফেরার। ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছলে আমাকে খাবার দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে কিছু টাকা, বাড়ি পৌঁছানোর জন্য। একবার যখন দেশে ফিরে এসেছি তখন আর ফিরে যাব না। এখনও আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তার ওপর অসুস্থ বাবাসহ পাঁচ সদস্যের এক পরিবারের দায়িত্ব আমার কাঁধের ওপর। বর্তমানে আমি রিক্সা চালাই। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। শুনেছি লিবিয়া ফেরত অভিবাসীদের সরকার ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে। সেই থেকে মহাজনেরা আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। খোলা আকাশের নিচে রাত কাটিয়ে, মিলিশিয়াদের গুলির নিচে পড়ে আমি লিবিয়া থেকে ফিরত এসেছি। আমি কমপেনসেশন চাইনা, কাজ চাই।

আমি গৃহযুদ্ধ দেখেছি

হারুন মিয়া

২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে লিবিয়ায় গিয়েছিলাম ২৮ বছর বয়সে। অভিবাসনে আমার খরচ হয়েছিল দুই লাখ ৬৫ হাজার টাকা। আমি তিউনিসিয়ার সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকা নাটোল-এ একটা কোরিয়ান কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করতে শুরু করেছিলাম। কোম্পানির নাম কসমো। বেতন ছিল প্রতি মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকা। তখন লিবিয়াতে কাজ করা খুব কঠিন।

আমার সহকর্মীদের অধিকাংশই তখন নাটোলে মাত্র ছয় মাস কাজ করার সুযোগ পেত। আমার পরিবার আমার অভিবাসনের পেছনে যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছিল তা উঠানোর জন্য যুদ্ধের মধ্যেও আমি সেখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিদ্রোহীরা এলো এবং কোম্পানির কার্যালয়ের চারপাশ তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করল, যেখানে আমি থাকতাম। কর্তৃপক্ষ তখন অবস্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। আমার সম্পদের ভেতরে ছিল পোশাক, কম্বল, ডেকচি, পাতিল ইত্যাদি। অবস্থান পরিবর্তনের সময় আমি কিছু কিছু জিনিস সঙ্গে নিতে চাইলাম, কিন্তু কোম্পানির কর্মকর্তারা কোন কিছুই সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দিল না। সীমান্তের অন্যপাশে পৌঁছানোর পর খোলা আকাশের নিচে আমরা ছিলাম বিশ দিনেরও বেশি এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ফিরে আসি। ফিরে আসার পর ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করছি। আমার ফিরে আসায় কেউ সন্তোষ প্রকাশ করে নাই। আমার ভাইয়ের স্ত্রী চায় যত দ্রুত সম্ভব আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, যদিও এটা আমার বাবার বাড়ি। লিবিয়ায় অভিবাসনের খরচ যোগাতে পৈতৃক সম্পদের আমার অংশটুকু বিক্রি করতে হয়েছিল কিন্তু বসতবাড়িতে আমার অংশটা এখনও আছে। আমার ভাগ্য এখন অনিশ্চিত। জানিনা কী করব! আমার কী আবারো বিদেশ যাওয়া উচিত! নাকি বাংলাদেশেই কোনো কাজ করা উচিত! কে আমাকে কাজ দেবে?

মুসলমান হয়ে হিন্দুর গলাকাটা পাসপোর্টে গেছি

নাসিরুদ্দিন আহমেদ

আমি ফেনী শহরের বাসিন্দা। সাতাশ বছর বয়সে বাবার জমি এবং মায়ের গহনা বিক্রি করে অভিবাসনের খরচ যোগাড় করেছিলাম। আমি ২০১০ সালে গিয়েছিলাম লিবিয়ায়। খরচ বাবদ দুই লাখ ৭০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম নয়াপল্টনে অবস্থিত "মাইক্রো এক্সপোর্ট এজেন্সি"-র এজেন্ট মোস্তফাকে আমার ভিসা প্রক্রিয়া করার জন্য। প্রথম অবস্থায় মোস্তফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমি লিবিয়ায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাব যদি পুরো টাকার বেশি অংশটা দিয়ে দেই। যাইহোক, কথামতো টাকা দেওয়ার পর সে যাওয়ার তারিখ নিয়ে হেলাফেলা করে সময় অপচয় করতে থাকে। এক সকালে আমি তাকে চাপ দেওয়ার পর আমাকে ঢাকায় আসতে বলে। সে রাতেই লিবিয়াগামী ফ্লাইট ধরার জন্য। ঢাকায় এসে পাসপোর্ট দেখে আমি বিস্মিত হই, কারণ পাসপোর্টে আমার ছবি থাকলেও নাম হচ্ছে গোপেশ চন্দ্র ভৌমিক, বাবার নাম উমেশ চন্দ্র ভৌমিক। বিষয়টি তদন্ত করলে মোস্তফা জানায় এটাই একমাত্র ব্যবস্থা এখন লিবিয়া যাওয়ার। অন্যথায় এক বছর সময় লেগে যাবে লিবিয়া যেতে। পাসপোর্টে থাকা ব্যক্তিগত যাবতীয় তথ্য মুখস্থ করতে মোস্তফা আমাকে সাহায্য করেছিল। হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলিও তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। যদিও সেই রাতেই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু তারপরও দুদিন দেরি হয়। লিবিয়া পৌঁছানোর পর আমাকে একটা ডরমিটরিতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে সবাই ছিল মুসলিম এবং অধিকাংশই বাংলাদেশী। জানাজানি হওয়ার ভয়ে আমি একজন হিন্দুর মতো ভান করতাম। না খেতাম গরুর মাংস না পড়তাম নামাজ। এমনকি ঈদের দিনেও নয়। কাজ করতাম কিন্তু নিয়মিত বেতন পেতাম না। মাত্র দশ মাস লিবিয়াতে কাজ করেছিলাম। তারপর গৃহযুদ্ধ সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আমি বেনগাজিতে ঘটে যাওয়া সেইসব বিভীষিকাময়

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা এই অবস্থায় তখন মিশরীয় সীমান্তের দিকে চলে গিয়েছিলাম। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রত্যাবাসিত হয়েছিলাম বাংলাদেশে। বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিবিয়া থেকে ফেরত-আসা প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেছে। আমার প্রমাণপত্রাদি প্রক্রিয়াকরণের সময় আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমি ক্ষতিপূরণ পাব না কারণ আমার প্রকৃত নাম ও স্থায়ী ঠিকানার সাথে পাসপোর্টের কোনো মিল নাই যে পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ গিয়েছিলাম। আমার এই ক্ষতি কোনভাবেই আর পূরণের নয়।

গরিবরা সুবিচার পায় না

স্বপন মিয়া

আমি রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা। বয়স ২৫ বছর। আমি ২০১০ সালে লিবিয়ায় গিয়েছিলাম। লিবিয়ায় যাওয়ার আগে দালাল আমাকে আমার কাগজপত্র দেয়। লক্ষ্য করি যে পাসপোর্টধারীর নাম আসাদুজ্জামান। সে ফরিদপুরের বাসিন্দা। অথচ পাসপোর্টের ছবিটা আমার। বিষয়টা দালালকে জিজ্ঞাসা করলে সে শারীরিকভাবে আমাকে আঘাত করে। সেই অবস্থায় আমার জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সহকারী এজেন্টের নাম ছিল আতিক। সেও রাজশাহীর লোক ঢাকা ভিত্তিক একটা রিক্রুটিং কোম্পানির জন্য কাজ করছে। যেহেতু আমার পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না সে কারণে দালাল জমি দখল নেয় এই শর্তে যে যদি লিবিয়াতে কাজ না পাই তাহলে সে জমি ফেরত দেবে। সবকিছুরই একটা লিখিত চুক্তি হয়েছিল। লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর দেখলাম বিমান বন্দরে কেউ আমাকে নিতে আসে নাই। তখন আমি অসহায় হয়ে পড়ি। আমার কাছে চাকরিদাতার ঠিকানা ছিল এবং বিমানে পরিচয় হওয়া অন্য এক বাংলাদেশীর সহায়তায় সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। দালাল সরাসরি কোনো চাকরিদাতার সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা দেয় নাই। বরং দেখা গেলো ঠিকানাটা হলো একটা শ্রমিক সরবরাহ কোম্পানির। সরবরাহকারী আমাকে কোনো নিয়মিত কাজ দেয় না। তারা যেখানে যেতে বলে কাজের উদ্দেশ্যে সেখানেই যাই। অন্যথায় অলস অবস্থায় দিন কাটে। দিনে দিনে মেজাজ বিগড়ে যায় এবং দালালকে বলি আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু দালাল রাজি হয় না। লিবিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার কারণে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দালালের কাছে গেলাম কিন্তু সে আমার জমি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সে আরও জানায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে চাকরি দিয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে আমি ফিরে এসেছি। তখন আমি গ্রামের চেয়ারম্যানের কাছে গেলাম এবং একটা সালিশের ব্যবস্থা করে বিষয়টা নিস্পত্তি করার দাবি জানালাম। চেয়ারম্যান বিষয়টা আমলেই আনল না এবং আমার জমি উদ্ধার করার অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। আমাকে সাহায্য করতে চায়নি, কারণ আমি গরিব। সুতরাং আমি সুবিচার পাব না। আমার এখন অবস্থা খুবই খারাপ।

বিদেশে যাওয়ার পরিবর্তে গেলাম জেলে

মোহাম্মদ আমিরুল্লাহ

আমার বাড়ি টাঙ্গাইলের নেধার গ্রামে। আঠার বছর বয়সে ২০১৩ সালে কাজের উদ্দেশ্যে লিবিয়া যেতে চেয়েছিলাম। পরিবারে আমরা চার ভাই তিন বোন। দুই বছর আগে বাবা-মা-র মৃত্যু হয়েছে। বিয়ে হয়ে গেছে বড় বোনদের। ভাইদের মধ্যে আমি সবার বড়। আমি বিবাহিত কিন্তু আমার কোনো সন্তান নাই। আমার ছোট ভাইয়েরা লেখাপড়া করছে। এ সময় আমি পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব অনুভব করলাম। অতঃপর একজন দালাল খুঁজে বের করলাম যে প্রতিশ্রুতি দিল বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে সে আমাকে সাহায্য করবে। আমি তাকে অভিবাসনের জন্য চার লাখ টাকা দিলাম। এই টাকা ধার করলাম আমার আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামের কিছু পরিচিত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। যাইহোক, দালাল লোকটা ছিল অসৎ। সে আমার কাগজপত্র জাল করেছিল। যখন আমি বিমান বন্দরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন বিমান বন্দরের একজন তদন্তকারী দেখল যে আমার তথ্য প্রমাণাদি জাল। সুতরাং বিদেশ যাওয়ার পরিবর্তে জেলে যেতে হলো এক মাসের জন্য। এক মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেলাম। আমার এখনও বেশ কিছু ঋণ আছে যা পরিশোধ করতে হবে। আস্তে আস্তে তা পরিশোধ করছি। বর্তমানে ড্রাইভিং শিখতে চাই। সৌভাগ্যক্রমে রামরু'র ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি এবং প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। ভবিষ্যতে এই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারব আশা করছি। হয়তো একদিন আমি কোনো ব্যক্তির অথবা কোনো কোম্পানির গাড়ি চালানোর কাজ পাবো।

ভাগ্য খুলতে খুলতে বন্ধ হয়ে গেল

খাইরুল ইসলাম

আমার বয়স ২৪ বছর এবং আমি রংপুর জেলার অধিবাসী। আমি ২০০৯ সালের শেষ দিকে কাজের উদ্দেশ্যে লিবিয়া গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে লিবিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রমিক সরবরাহকারী কোম্পানি আমার পাসপোর্ট জোরপূর্বক জব্দ করে। আমরা ৫৬ জন মানুষ একটা পরিত্যক্ত গুদাম ঘরের ভেতরে গাদাগাদি করে ছিলাম। লিবিয়াতে আমার অভিজ্ঞতা ছিল খুবই খারাপ। প্রথম বছরে আমার সঙ্গে এমন আচরণ করা হতো যেন আমি একজন দাস। বার ঘন্টা কাজ করতাম কিন্তু কোনো বেতন পেতাম না। সকাল বেলা কাজে নিয়ে যাওয়া হতো এবং গুদামে ফিরিয়ে আনা হতো কাজ শেষ হওয়ার পর। আমাদের সঙ্গে আচরণ করা হতো বন্দীর মতো। বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করেছিলাম এবং তারা আমার বেতনও দিয়েছিল কিন্তু আমি তা কখনও পাই নাই। কারণ তারা তা সরাসরি দিত অর্থলিপ্সু শ্রমিক সরবরাহকারী কোম্পানিকে। বেতন না দেওয়াটা প্রকৃত অর্থে আমার একার সমস্যা ছিল না। আমরা ৫৬ জনই একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাদের একজন সঙ্গী সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিল এবং বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়ে জানিয়েছিল আমাদের অবস্থা। পরবর্তীকালে দূতাবাস আমাদেরকে মুক্ত করে সেই অভিশপ্ত গুদাম ও কোম্পানির নিষ্ঠুরতা থেকে।

গাদ্দাফী মরলো আমারও ভাগ্য পুড়লো

মোহাম্মদ মিনহাজ

টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আমি এবং একজন ফেরত আসা অভিবাসী। চব্বিশ বছর বয়সে ২০০৯ সালে একজন দালালের মাধ্যমে কাজের উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় গিয়েছিলাম। আমার এক আত্মীয় ইতিমধ্যেই বিদেশ গিয়ে কাজ করছে এবং সেও গিয়েছে দালালের মাধ্যমে। সেই একই দালালের সঙ্গে তারা আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। দালাল বলেছিল আমি লিবিয়ার কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতে পারব। সে আরও বলেছিল এইজন্য তাকে দিতে হবে এক লাখ ৭০ হাজার টাকা। আমি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকাটা ঋণ করেছিলাম। দালাল বলেছিল যাওয়ার আগে আমাকে কাঠমিস্ত্রির কাজ শিখে যেতে হবে। সেই কারণে এলেঙ্গাতে একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমি কাঠমিস্ত্রির কাজ শিখেছিলাম। লিবিয়া পৌঁছানোর পর কাঠমিস্ত্রির কাজ পেলেও বেতনের ব্যাপারে হতাশ হলাম। কারণ আমার বেতন ছিল মাত্র নয় হাজার টাকা। যাই হোক, আমার থাকা ও খাওয়ার খরচ বহন করত কোম্পানি। তখন আমি চেষ্টা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করলাম এবং এক বছর পর এক লাখ টাকা দেশে পাঠালাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে লিবিয়াতে ২০১১ সালে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর গাদ্দাফী মারা গেল। আমারও ভাগ্য পুড়লো। সব ফেলে শুধু প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হলাম। বিদেশ যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বেশি আয় করা। যুদ্ধের কারণে তা সম্ভব হয় নাই। দেশে আমার পরিবারের কিছু জমি আছে কিন্তু তা খুব বেশি নয়। ভাইদের ভেতরে আমি সবার বড়। ছোট ভাই বর্তমানে আর লেখাপড়া করছে না। বেকার জীবন কাটাচ্ছে। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর আমি অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। ড্রাইভিং শেখার একটা সুযোগ পাই বেসরকারি সংস্থা রামরু'র মাধ্যমে। ড্রাইভিং শিখে এখন আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। ড্রাইভার হিসেবে কাজ করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে- হয় বাংলাদেশে নয় বিদেশে।

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন

মালয়েশিয়া

গ্রেফতার এড়াতে বিদেশ যাই, সেখানে গিয়ে সফলতা পাই

রফিকুল মিয়া

আমি মাদারীপুরের অধিবাসী। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় একটা ফুটবল ম্যাচ নিয়ে প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছিল। বিষয়টি পুরোপুরি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল অন্য গ্রামের একটা ছাত্র। প্রতিবেশী গ্রামের লোকেরা অনেকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। এমনকি আমাদের বিরুদ্ধেও যারা খেলায় অংশ নিয়েছিলাম।

এদিকে ২০০৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় এসে যাদের নামে মামলা আছে তাদেরকে গ্রেফতার করতে শুরু করেছিল। আমার বাবা খুবই দুঃশ্চিন্তায় ছিল আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কারণ আমি জেলে গেলে কোনদিন ভালো চাকরি পাব না। এ অবস্থায় তিনি আমার জন্য মালয়েশিয়ার একটা ভিসার ব্যবস্থা করেন। আমি মালয়েশিয়ায় তালগাছ লাগানোর কাজ করতাম এবং কাজের পরিবেশ ছিল খুবই কঠিন।

এক বছরের ভেতরে আমি এক হাজার আটশ মালয়েশিয়ান রিংগিট সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং সেই সঙ্গে পেয়েছিলাম একটা নতুন কাজের ভিসা যা আমাকে শহরে কাজ করার অনুমতি দেয়। গত পাঁচ বছর ধরে ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করেছি। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেছি ফলের রস। আমার চাকরিদাতা একজন মহিলা। সে আমার সঙ্গে মায়ের মতো ব্যবহার করে এবং আমার ওপর তার পুরোপুরি আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। গত বছর সে আমার ভাইকে কাজের জন্য মালয়েশিয়ায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। প্রথমে আমরা তার জন্য কনস্ট্রাকশনের কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম। পরবর্তীতে এক বন্ধুর মাধ্যমে কফি শপে কাজের ব্যবস্থা করি। আমরা উভয়েই বাড়িতে টাকা পাঠাই। এই ব্যবস্থাপনায় আমার বাবা খুবই খুশি। কিন্তু মাঝে মধ্যে এক রকম বেদনা অনুভব করি যে, আমি এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারি নাই।

বিচার চাবো কি করে? ফেরার পর দালালতো কাগজপত্র নিয়ে নিয়েছে

মোহাম্মদ সায়েম

যশোর জেলার শার্শা গ্রামে আমার বসবাস। পেশায় আমি একজন কাঠমিস্ত্রি। দালালের মাধ্যমে ২০১০ সালে মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল ৪০ হাজার টাকা। দালাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেখানে ফার্নিচার তৈরির ফ্যাক্টরিতে কাজ পাব। সে আরও বলেছিল ভ্রমণ-ভিসা নিয়ে আমাকে প্রথমে মালয়েশিয়ায় যেতে হবে। তারপর ভ্রমণ-ভিসা পরিবর্তিত হবে

কাজের ভিসায় এবং পরবর্তীকালে সময় বাড়ানো হবে। আমি দালালকে বিশ্বাস করে এই ব্যবস্থাপনায় সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু মালয়েশিয়ায় যাওয়ার তিন দিন পর পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে স্বল্পকালীন আটক রাখার স্থানে নিয়ে যায় এবং বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। আমি দালালের সাথে যোগাযোগ করে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দাবি করলে সে আমাকে যাবতীয় কাগজপত্রসহ তার ওখানে যেতে বলে। পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সমস্ত কাগজপত্র হাতিয়ে নেওয়াই ছিল তার পরিকল্পনা এবং তার অফিসে গেলে সে তাই করে। আমি খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, কারণ, আমি তার বিরুদ্ধে এখন কোন অভিযোগ করতে পারব না। কারণ কী ঘটেছিল তার কোনো প্রমাণ আমার কাছে নাই। টাকা লেনদেনেরও কোনো সাক্ষী নাই। সুতরাং আমি পুরোপুরি বেকুব বনে গেছি।

অভিবাসন আমার জন্য শুধু দুঃস্বপ্নই বয়ে এনেছে

মোহাম্মদ হাশেম

আমার কাহিনীটা হলো সাদা এবং কালো। অর্ধেকটা আলোকিত এবং অর্ধেকটা অন্ধকার। আমি ১৯৮৯ সালে কাজের উদ্দেশ্যে ইরাকে গিয়েছিলাম। সেখানে উপার্জন ভালোই হচ্ছিল। কিছুদিন পর ইরাক ও কুয়েতের ভেতরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন সমস্যা ও যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশে ফিরে আসাও তখন কঠিন ছিল। আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান যে নিরাপদে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলাম। যুদ্ধ শেষ হলে জানলাম যে ইরাক সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। সে অনুসারে একটা আবেদনপত্র তৈরি করলাম এবং বিএমইটি-র মারফত তদন্ত করে জানলাম আমি কিছু ক্ষতিপূরণ পাব। তবে সেই অর্থ পেতে বহু ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল। কিছুদিন পরই আমি আবার বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবারে গন্তব্য মালয়েশিয়া। সাধারণ শ্রমিক হিসেবে ১৯৯৮ সালে সেখানে যাই। চাকরিদাতা বলেছিল আমি প্রতিদিন ৩০ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত পাবো কিন্তু তারা আমাকে দিত মাত্র ১৭ রিঙ্গিত। বুঝতে পারলাম যে তারা আমাকে প্রতারিত করেছে। এই আয় দিয়ে ওখানে জীবন চালানো সম্ভব ছিল না। একইসঙ্গে সম্ভব ছিল না বাড়িতে অর্থ পাঠানো কারণ তা ছিল খুবই অল্প। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারছিলাম না যে কী করব।

এমন সময় আমি ড্রাইভারের চাকরি পেয়ে গেলাম। বেতন প্রতি মাসে আট হাজার টাকা। আমার উপার্জন কখনও যথেষ্ট ছিল না যা থেকে আমি সঞ্চয় করতে পারি। যদিও দেশত্যাগ করার আগে সবসময়ই ভেবেছি যে সঞ্চয় করতে হবে। মালয়েশিয়াতে এভাবেই আমার জীবন কেটেছিল ২০০৮ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশে ফিরে আসার পর বিএমইটি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করি। যাদের ব্যবস্থা করা চাকরির মাধ্যমে আমি প্রতারিত হয়েছিলাম, যাদের কারণে মালয়েশিয়া থাকাকালীন আমি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছি। লোকে যখন অভিবাসনের অভিজ্ঞতা জানতে চায় তখন সেইসব দিনের ভয়াবহ স্মৃতি স্মরণে আসে। এখন আমি স্ত্রী ও পুত্রসহ বাবার বাড়িতে বসবাস করছি। বাংলাদেশে আমি একটা ব্যবসা শুরু করতে চাই। বিদেশ যাওয়ার আর কোনো পরিকল্পনা আমার নাই।

আর নয় বিদেশ এবার দেশ

সুনীল মন্ডল

আমার নাম সুনীল মন্ডল। অভিবাসী হিসেবে মালয়েশিয়াতে ছয় বছর কাটিয়েছি। বিদেশ যাওয়ার আগে লেদ মেশিনের চালক হিসেবে কাজ করেছিলাম এবং পরবর্তীতে অটো মেকানিক হিসেবে। মালয়েশিয়াতেও মেকানিক হিসেবে কাজ করেছি। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর আমি প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা আয় করতে শুরু করেছিলাম। এই উপার্জন থেকে নিজের খরচ চালানোর পর দেশে টাকা পাঠাতাম এবং কিছু সঞ্চয়ও করতাম। বিদেশ গিয়ে যদি কেউ অর্থ সঞ্চয় করতে না পারে তাহলে বিদেশ যাওয়ার কোনো দরকার নাই।

ছয় বছর পর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। সেই সময় আমার কিছু আত্মীয় উৎসাহিত করে গাড়ি মেরামতের নিজস্ব একটা কারখানা চালু করতে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আমি মালয়েশিয়ায় থাকাকালীন অর্জন করেছিলাম। মালয়েশিয়ায় কাজের পরিবেশ ও বাস্তবতা দুটোই ছিল অনেক উন্নত, ফলে সত্যিই আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। নিজস্ব কারখানা চালু করে সফল হয়েছি। বর্তমানে আটজন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে আমার কারখানায়। এটা করা খুব একটা সহজ ছিল না এবং আমি আমার অর্জনে খুবই গর্বিত। বর্তমানে যা উপার্জন করছি তা পরিবারের জন্য যথেষ্ট। আমি আর বিদেশ যেতে চাই না। নিজের ব্যবসায় উন্নতি করতে চাই। চাই দেশের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করতে।

আমার অভিবাসী স্বামী গ্রামের মানুষদের জন্য কিছু করতে চায়

জোবেদা খাতুন

আমার বিয়ে হয় ১৯৯৯ সালে এবং তখন বয়স ছিল তের বছর। স্বামীর বয়স তখন মাত্র সতের। এক বছর পর অর্থাৎ ২০০০ সালে আমার স্বামী কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল। এ সময় আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। তখন এমনও দিন গেছে যে আমি একবেলা খেয়ে থেকেছি।

আমার স্বামী ছিল একজন দিনমজুর। প্রতিদিন তার রোজগার ছিল একশ বিশ থেকে একশ নব্বই টাকা। তার বাবার একটা ছোট ঘর ছিল বসবাসের জন্য। কিন্তু কোনো কৃষিজমি ছিল না। পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমার স্বামীর কাজ প্রায়ই ব্যাহত হত যেমন, বন্যা, বৃষ্টি ইত্যাদি। এ সময়ে আমাদের অর্থ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠত। খুবই কঠিন সময় গেছে তখন। আর্থিক অনটনে দুর্দশার ভেতরে দিন কাটাতে হয়েছে।

একদিন আমার এক মামা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। তার পরিবারের কিছু সদস্য মালয়েশিয়ায় কাজ করে এবং বসবাস করে। সে জানায় আমার স্বামীর জন্য একটা ভিসার ব্যবস্থা সে করতে পারবে। এ প্রক্রিয়ায় এক সময় আমার স্বামী মালয়েশিয়া যায়। খরচ হয়েছিল দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা। এই টাকা যোগাড় সম্ভব হয়েছিল আমার শ্বশুর ও অন্য এক আত্মীয়ের যৌথ প্রচেষ্টায়। মালয়েশিয়ায় পৌঁছানোর পর সে প্রতি মাসে ৩৭ হাজার টাকা

উপার্জন করতে থাকে। দুই বছরের মধ্যে অভিবাসনের সময় নেওয়া ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়। এ সময়ে অন্য কোনো খাতে আমরা টাকা খরচ করতে পারি নাই। তৃতীয় বছরে বসতবাড়ির জন্য সাত ডেসিমেল জমি কিনেছি যার বর্তমান মূল্য এক লাখ ৫০ হাজার টাকা। আরও ৮৪ ডেসিমেল কৃষিজমি কিনেছি ২০০৫ সালে যার বর্তমান মূল্য ১১ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। এছাড়া একটা আধা-পাকা বাড়িও করতে পেরেছি। আমার স্বামীর পাঠানো রেমিটেন্স দিয়ে ২০১৪ সালে ৩০ হাজার টাকার বেশি কৃষিপণ্য বেচাকেনা করে ভালো লাভ করেছিলাম।

স্বামীর কারণে আমাদের পরিবার এক ধরনের সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। আমাদের এখন বিভিন্ন ধরনের সুযোগ আছে যা আগে ছিল না। এখন আমরা অসুস্থ হলে সহজেই হাসপাতালে যেতে পারি। পরবর্তী পাঁচ অথবা ছয় বছরের ভেতরে কোনো এক সময়ে আমার স্বামী দেশে ফিরে আসবে। সে একটা পুকুর কিনতে চায় মাছচাষ করার জন্য এবং একই সঙ্গে গড়ে তুলতে চায় একটা মাছের খামার। আমাদের বর্তমান সমৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সে গ্রামের উন্নতিও করতে চায় যেন গ্রামের মানুষ লাভবান হয়। অভাবের দিনে যে আত্মীয়-স্বজনেরা সাহায্য করেছিল তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। সত্যিই আজ আমাদের নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে হয়।

বিদেশ যাওয়ার নেশা আমার আজও কাটে নাই

মোহাম্মদ সীমান্ত

মাগুরার পারকুলিম গ্রামের বাসিন্দা আমি। বড় ভাইয়ের সংসারে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় আমাদের বাবা মা দুজনেই মারা গেছে। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্য ১৬ জন। তা সত্ত্বেও এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পেরেছিলাম। অবশেষে ২০০৬ সালে এক এজেন্সিকে এক লাখ টাকা দিয়েছিলাম কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার জন্য। এজেন্সি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে একটা চাকরি পাওয়ার, যার বেতন হবে প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা। তিন মাস পর ভিসার ব্যবস্থা হলো, প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষায়ও আমি উতরে গেলাম। এমন সময় আমার এক প্রতিবেশী জানাল একই এজেন্সি তাকেও নিরাপত্তারক্ষীর চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরবর্তীতে কাজ দিয়েছিল পাম-ওয়েল ক্ষেতে। কিন্তু আমার মালয়েশিয়ায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করার জন্য এই তথ্য যথেষ্ট ছিল না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ডাক্তারি পরীক্ষায় আমার হেপাটাইটিস-বি ধরা পড়ে। এ কারণে আমার আর বিদেশ যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। বহু প্রচেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত দালালকে দেওয়া এক লাখ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এখনও আমি আশা করি যে কোনো একদিন কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যেতে পারব। তখন হয়তো আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি হবে।

তালিকা থেকে বাদ পড়ি কিন্তু কারণটা জানতে পারি নাই

সাদেকা

আমার নাম সাদেকা। আমি চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা। পেশায় একজন ব্যবসায়ী হলেও ব্যবসায় তেমন সফলতা কখনও আসে নাই। আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য বছরের পর বছর সংগ্রাম করেছি। আট মাস আগে আমার বোনের মাধ্যমে জানতে পারি যে মালয়েশিয়াতে গৃহকর্মীদের কাজের সুযোগ আছে। আমি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ে যোগাযোগ করি এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সেখানে জমা দেই। তারা আমাকে বিএমইটি-র ডাটাবেজে তালিকাভুক্ত হতে সাহায্য করে। আমার ওজন ও উচ্চতাও পরীক্ষা করে বিএমইটি। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আমার কাগজপত্র পাঠানো হয়। এমনকি অন্যান্যদের সঙ্গে আমার নামও পাঠানো হয়। কিন্তু তারপরও আমাকে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয় না। এটা ছিল আমার জন্য একটা মারাত্মক হতাশার কারণ। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান পুরোপুরি যোগ্য বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও আমার আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কখনও ব্যাখ্যা করে নাই কেন আমাকে বাদ দেওয়া হলো।

অন্যদের সাথে তফাৎ তৈরি করেছে আমার কর্মদক্ষতা

আব্দুল খালেক

টাঙ্গাইল জেলার বানকিনা গ্রামে আমার বসবাস। গ্রামের অনেকের মতো আমার পরিবারও দারিদ্র্যতার ভেতরে আটকা পড়েছিল। এইচএসসি পাশ করেছিলাম কিন্তু কোনো চাকরি পাচ্ছিলাম না। ফলে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। চাকরি না পাওয়ায় বাবা-মা আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। আমি বুঝতে পারতাম না কী করব। আশেপাশের অনেক পরিচিত মানুষজন তখন কাজের জন্য বিদেশ গিয়ে জীবন বদলে ফেলছে। সুতরাং স্থানীয় চাকরির চেয়ে এই সুযোগ নেওয়াটা অধিক বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হলো। আরও উপলব্ধি করলাম আমি যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারি তাহলে অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারব। ফলে শিক্ষানবিশ হিসেবে রড-মিস্ত্রির কাজ শিখতে শুরু করলাম। দু'বছর পর আমি কাগজপত্র জমা দিলাম এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করলাম অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা। আমি মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম ১৯৯৮ সালে এবং মালয়েশিয়া যাওয়ার আগে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যা উপার্জন করার তা পাঁচ বছরের ভেতরেই করতে হবে। যাই হোক, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ পেয়ে যাই। বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার আগে আমি ব্যাংকে দুটো একাউন্ট খুলে গিয়েছিলাম, একটা আমার পরিবারের নামে এবং একটা আমার নিজের নামে। পরিবারের একাউন্টে পাঠানো টাকা থেকে পরিবারের যাবতীয় চাহিদা মেটানো হয়। পাশাপাশি আমার নিজের একাউন্টেও কিছু সঞ্চয় করি। আট বছর বিদেশ থাকার পর ২০০৬ সালে আমি বাংলাদেশে ফিরে এসেছি। ফিরে আসার পর প্রথম যে কাজ করেছি তা হলো তিনটি পুকুর লিজ নিয়ে শুরু করেছি মাছ চাষ। দেখাশোনার জন্য

লোক রেখেছি একজন। বসতবাড়ি সংলগ্ন জমিতে প্রায় একশ গাছ লাগিয়েছি। সেই সঙ্গে হলুদ, আদা ও কলার চাষ করছি। তাছাড়া আমার চাচার কিছু পতিত জমি লিজ নিয়ে পেঁপে ও মৌসুমী ফলসহ শুরু করেছি সবজি চাষ। এক বছরের মধ্যে এসব উদ্যোগ থেকে উপার্জিত টাকা দিয়ে আরও দুটো পুকুর লিজ নিয়ে সম্প্রসারিত করেছি মাছচাষ। এসব উদ্যোগের কারণে প্রতিবেশীদের ওপর আমার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। ফলে অনেকেই আমাকে অনুসরণ করে এ ধরনের উৎপাদনমুখী কাজ শুরু করেছে। সুন্দর একটা বাড়ি করেছি ২০০৮ সালে। কিনেছি আরও ২০ ডেসিমেল জমি এবং সেখানে আরও দুটো বাড়ি করেছি। স্ত্রীকে কিনে দিয়েছি একটা সেলাই মেশিন। সবশেষে বলা যায় আমি আমার জীবন নিয়ে আনন্দিত এবং সুখী। জীবনে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সাফল্য।

দালাল অদৃশ্য এক অবকাঠামোর অংশ এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে খুবই ক্ষমতাবান

মোহাম্মদ শরীফ

আমার বয়স পনেরো বছর। টেকনাফ জেলার বিলগ্রামে আমার বসবাস। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি ছিলাম টেকনাফ পাইলট হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে সময় গুরু মিয়া নামে বুনিয়া গ্রাউন্ডের এক দালাল আমাকে মালয়েশিয়ায় একটা চাকরির প্রস্তাব দেয়। প্রলোভিত হয়ে আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। তারা আমাকে সবরঙ ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আরও অনেকের সঙ্গে একটা ইঞ্জিন-লাগানো নৌকায় তুলে দেয়। এই বড় নৌকায় পনেরজন নারীসহ প্রায় তিনশত লোক ছিল। নারীদেরকে রাখা হয়েছিল একটা ছোট কামরায় আর পুরুষরা পুরো নৌকায় গাদাগাদি করে বসেছিল। নারীদেরকে যৌন হয়রানি করা হচ্ছিল। আমরা কেবলই তাদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম নিচ থেকে কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না। আমাদেরকে যে বন্দী করে রেখেছিল তার এরকম জঘন্য কর্মকান্ডের কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার সাহস কারও ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছিল থাইল্যান্ডের সানখালা প্রদেশের গভীর জঙ্গল থেকে, যা ছিল মানব-চোরাকারীদের পুরানো ঘাঁটি। পরবর্তীকালে বিমানে করে আমাদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আমার অভিবাসনের অভিজ্ঞতা বিভীষিকাময়। দালাল আমাদের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করত তা মনে হলে আজও ভয় হয়। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নাই। কারণ দালাল থাকে সবসময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এক নৃশংস অভিজ্ঞতার সাক্ষী আমি

মালেক

আমি টেকনাফের কাছাকাছি শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা। একদিন এক দালাল আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় মালয়েশিয়াতে একটা চাকরি দেওয়ার। তার মুখ থেকে চমৎকার সব কথা শুনে আমি প্রলুব্ধ হই। তার ফাঁদে পা দেই। আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। আমিসহ প্রায় তিনশ জন লোক একটা জাহাজে চড়ে বসেছিলাম। আমরা যাত্রা করেছিলাম মায়ানমারের

দিকে এবং আটাশ দিন পর পৌঁছালাম থাইল্যান্ডে। আমাদেরকে নৌকায় করে জঙ্গলের মাঝখানে একটা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। গুদামের মতো একটা বড় ভবনে আমাদেরকে রাখা হয়, যেখানে সারাক্ষণ পাহারা দেওয়া হচ্ছে। তখন সবাই বুঝতে পারলাম যে আমরা মানবপাচার–চক্রের খপ্পরে পড়েছি। মালয়েশিয়ায় আমাদের জন্য কোনো কাজ নাই। এটাই ছিল আমাদের নিয়তি। যারা আমাদের বন্দী করেছিল তাদের কাছে আমরা মুক্তিভিক্ষা করলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তারা আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করত তা মুখে উচ্চারণ করা যায় না। শারীরিক নির্যাতন, হিংস্র আচরণ এবং যৌন নির্যাতন, অন্যায়ভাবে শারীরিক সুবিধা গ্রহণ সবই চলতো আমাদের সাথে। মারধোর করার ফলে অনেকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। মোটকথা এটা ছিল নৃশংস একটা অবস্থা। আমাদেরকে কেবলই শুকনো খাবার খেতে দেওয়া হতো। কয়েক শত বাংলাদেশী ও মায়ানমারের রোহিঙ্গা ছিল এই বন্দিশিবিরে। আমি তখন আবিস্কার করি যে টিকে থাকা ও এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো যারা আমাদের বন্দী করেছে তাদের মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করা। আমি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা দুই লাখ ৩৫ হাজার টাকা টেকনাফের এক এজেন্টকে প্রদান করে। সেই এজেন্ট আমাদেরকে যে বন্দী করে রেখেছে তার সঙ্গে এ ধরনের কাজে জড়িত। এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থাই পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে এবং কারাগারে নিয়ে যায়। সেখানে দুমাস থাকার পর অবশেষে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। কখনোই ভাবতে পারি নাই যে এই পরিস্থিতি থেকে ফিরে আসতে পারবো।

পুলিশ না উদ্ধার করলে আমার ভাগ্যে কি ছিল কে জানে!

নবী আহমেদ

চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজারের বাসিন্দা আমি। সমুদ্র সৈকতে অর্থের বিনিময়ে পর্যটকদের ছবি তোলার কাজ করতাম। কিন্তু ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচনের প্রস্তুতিপূর্বে রাজনৈতিক সহিংসতা দেশের পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুললে পর্যটন শিল্পের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আমাদের উপার্জন বলতে গেলে বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় একজন দালাল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মালয়েশিয়াতে একটা চাকরি করার প্রস্তাব দেয়। আমার তখন যে আর্থিক অবস্থা সেক্ষেত্রে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন ছিল। সে জানায় যাওয়ার আগে কোনো টাকা দিতে হবে না। মালয়েশিয়া যাওয়ার পর মাসিক বেতন থেকে টাকা পরিশোধ করতে হবে। এমনকি সে আরও জানায় কিস্তি হিসেবে অর্থ পরিশোধ করার পরও বাড়িতে পাঠানোর জন্য অনেক অর্থ থেকে যাবে। যাই হোক, প্রস্তাবটা খুবই ভালো মনে হলো, যদি তা সত্য হয়। তারপরও তাকে জানালাম যে, আমি যেতে চাই না। এমন সময় আমার দুই বন্ধু ফেনীর রফিক ও চট্টগ্রামের মিঠু আমার সঙ্গে মালয়েশিয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এক রাতে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে তারা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তখন আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হই। তারা প্রথমে আমাদের একটা ছোট নৌকায় তুলে দিল। তারপর একটা বড় ট্রলারে। সেখানে আরও প্রায় একশ জনেরও বেশি বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা ছিল। আট দিন পর আমরা থাইল্যান্ডে পৌঁছালাম। তারপর বেশ অনেকটা দূর হেঁটে ট্রাকে উঠেছিলাম মালয়েশিয়ার বাদাম-বেসার সীমান্তের কাছাকাছি ক্যাম্পে পৌঁছানোর জন্য। সেখানে আমাদের জীবন

নরকে পরিণত হয়েছিল। আমরা ছিলাম ক্ষুধার্ত, পিপাসিত। ওখানে নিয়মিত আমাদেরকে পেটানো হতো। যারা আমাদেরকে বন্দী করেছিল, একদিন তাদের মধ্যে একজন আমাকে একটা টেলিফোন দিয়ে দেশের বাড়িতে ফোন করতে বলে। আমি আমার ভাইকে টেলিফোন করি এবং মুক্তিপণ হিসেবে দুই লাখ ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। সে আমাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সব কৃষিজমি বিক্রি করে দেয়। মুক্তিপণ পাওয়ার সাথে সাথে শারীরিক নির্যাতন বন্ধ হলেও আমাকে বন্দি করে রাখা হয়। এক সময় থাই পুলিশ ক্যাম্পে আকস্মিক হামলা চালিয়ে আমাদেরকে উদ্ধার করে। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। পুলিশ অবৈধভাবে থাইল্যান্ডে প্রবেশের অভিযোগ এনে আমাদেরকে জেলে পাঠায়। কিছুদিন পর আমরা দেশে ফিরে আসি।

সমুদ্রেই শুরু হয়েছিল বন্দিজীবন

রাশেদ

আমি সিরাজগঞ্জের অধিবাসী। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলাম কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো চাকরি খুঁজে পাই নাই। আমার এলাকায় অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া যাওয়ার। তাদের দেখাদেখি আমিও বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য দালালের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। দালাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আমাকে একটা ভিসা যোগাড় করে দেবে এবং সেখানে একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা হবে নিয়মিত বেতনসহ। দালাল আরও বলেছিল থাকা ও খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করবে কোম্পানি। আর এসব করার জন্য খরচ হবে দুই লাখ ২০ হাজার টাকা। এই টাকা যোগাড় করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম আমাদের সমস্ত জমি ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করতে। দালাল বলেছিল যাত্রাপথের ব্যবস্থা হবে পাঁচ তারকা হোটেলের মতো। স্প্রিং-আঁটা জাজিমে শোওয়ার ও অন্যান্য আয়েশের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু তার পরিবর্তে ব্যবস্থা হয়েছিল একটা বড় কাঠের নৌকার এবং তখনই আমি বুঝেছিলাম প্রতারণার শিকার হয়েছি। কিন্তু তখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমার বন্দিজীবন শুরু হয়েছিল সমুদ্রে। তারপর থাইল্যান্ডের জঙ্গলে। একই সঙ্গে বঞ্চিত হয়েছিলাম খাবার ও পানি থেকে। এমনকি গোসল করারও সুযোগ ছিল না এবং কোনো কারণ ছাড়াই আমাদেরকে পেটানো হতো। এভাবে বহুদিন চলার পর একদিন থাই পুলিশ আকস্মিক হামলা চালিয়ে ক্যাম্প থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে। এই অবস্থা থেকে কখনও মুক্তি পাবো তা উদ্ধারের পরও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

চারিদিকে শুধুই ঠকবাজ

মোহাম্মদ জব্বার আলী

আমি মোহাম্মদ জব্বার আলী, যশোর জেলার বাসিন্দা। একটা রিক্রুটিং এজেন্সির সহযোগিতায় ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলাম কাজের উদ্দেশ্যে। যে দালাল এই এজেন্সির হয়ে কাজ করছিল সে আমাকে মালয়েশিয়ায় চাকরির সুযোগ সম্পর্কে বলেছিল। আমাকে একটা কাজের পারমিট দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল এ ব্যাপারে বিএমইটি-র যথাযথ

ছাড়পত্র রয়েছে। মালয়েশিয়া আসার পর বিমানবন্দরের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায় এবং এক সপ্তাহ পর তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। তারা আমাকে বলে যে ভিসা নিয়ে এসেছি তা শুধুমাত্র ট্যুরিস্ট ভিসাই না, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া একটা ভিসা। দেশে ফিরে এসে দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং অভিবাসনের জন্য দেওয়া দুই লাখ ২০ হাজার টাকা ফেরতের দাবি জানাই। তাদের প্রতারণার কারণেই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তারা দাবি অগ্রাহ্য করে এবং উপেক্ষা করে আমার অভিযোগ।

আমি জানি, এই ঘটনাটা হলো প্রতারণার একটা উদাহরণ। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অথবা অনলাইনের মাধ্যমে বিএমইটিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা উত্তম। বিষয়টা আগে আমি জানতাম না। অভিযোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করি নাই। নিজের সঞ্চিত অর্থে বর্তমানে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার একটা টিকেট কিনেছি। আবারও বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমি জানি না আমার ছেলে বেঁচে আছে না মরে গেছে

গনি মিয়া

আমার ছেলের নাম নবী হোসেন। আমরা সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাদাতপুর এলাকার অভিবাসী। এই কাহিনী শুরু হয়েছিল যখন আমার ছেলের বয়স সাতাশ বছর। আমাদের পরিবার মোটেও সম্পদশালী নয়। সে কারণে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার জন্য নবী হোসেন যোগাযোগ করেছিল একজন দালালের সঙ্গে। সে পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে চাইত। পরিকল্পনা করা হয়েছিল নৌকায় করে মালয়েশিয়া যাওয়ার। কিন্তু নবী সেটাতে রাজি ছিল না। তার যাওয়ার প্রক্রিয়াটা নিয়ে আমরা সত্যিই দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম এবং ঘটনাটা খুবই খারাপের দিকে গিয়েছিল। সতের দিন পর নবী আমাদেরকে টেলিফোনে তার উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা জানায়। সে আরও জানায় নৌকায় তাকে জিম্মি করে রাখা হয়েছিল এবং বিকাশ করে এখনই টাকা পাঠানো না হলে তাকে হত্যা করা হবে। তিন জনকে তারা ইতিমধ্যে সাগরে ছুড়ে ফেলেছে। তারা আমাদেরকে একজন দালালের বিকাশ একাউন্ট নম্বর দেয়, যেন অর্থ পাঠানোর কাজটা সহজ হয়। তখন অন্য কিছু চিন্তা করার অবসর ছিল না। আমি কিস্তিতে অর্থ পাঠাতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নাই। পুরো টাকা পরিশোধ করার পরও নবী ছাড়া পায় নাই। এমনকি টাকা পরিশোধ করার পর নবীর সঙ্গে কথাও বলতে পারি নাই। আমি এখনও জানিনা আমার ছেলে বেঁচে আছে না মরে গেছে।

এখনও পথ চেয়ে আছি

আজাদ আহমেদ

আমার নাম আজাদ আহমেদ। ছেলের নাম আহমদ আলী। সিরাজগঞ্জ জেলার ঠিকরির চর গ্রামে আমাদের বাড়ি। আহমদ আমার সঙ্গে শহরে দিনমজুরের কাজ করত। দারিদ্র্যের কারণে অর্থ উপার্জনের জন্য আমরা সব ধরনের কাজই করতাম। এক সকালে আমার ছেলে বলল, “তাড়াতাড়ি কাজে যাও নইলে দেরি হয়ে যাবে, আমি একটু পরই আসছি।” কিন্তু সেদিন সে

আর কাজে যায় নাই। পরবর্তীতে শাহাদাত নামে এক লোক টেলিফোনে জানায় যে আমার ছেলে মালয়েশিয়া যাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর আমি শাহাদাতকে গ্রামেই খুঁজে পাই। টেলিফোনে সে যা বলেছিল তা জানার চেষ্টা করলে এমন একটা ভাব দেখায় যে সে কখনও ফোন করে নাই এবং এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা। অনেক বোঝানোর পর অবশেষে শাহাদাত আমাকে দালাল ফয়সালের বাড়িতে নিয়ে যেতে রাজি হয়। আহমদ সম্পর্কে জানতে চাইলে ফয়সাল বলে ছেলে ফেরত পেতে হলে টাকা দিতে হবে। তখন আমি কী করবো বুঝতে পারছি না! আহমদ আমার ছেলে। যেহেতু আমি একজন দিনমজুর সেহেতু ঋণ করে ফয়সলের দাবি করা ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। খুবই চড়া সুদে নেওয়া হয়েছিল এই ঋণ। টাকার ব্যবস্থা করার পর মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ছেলের সঙ্গে আমার আর কথা হয় নাই। তাই এখনও টাকাটা দিই নাই। জানিনা আমার ছেলে বেঁচে আছে না মরে গেছে। আশায় আছি কোনো একদিন সে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

চেষ্টা করছি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার

মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া

আমার বয়স চব্বিশ বছর। বন্ধুর ভাইয়ের মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সম্পর্কে আমি জানতে পারি ২০১৩ সালে। গ্রামে তখন কোনোভাবেই আমার মন টিকছিল না। কারণ তিন মাসের মধ্যে আমার পরিবারের তিন সদস্য মারা যায়। হতাশায় ভুগতাম। আমার জন্য সেটা ছিল খুবই খারাপ সময়। তখন একজন দালাল বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। অভিবাসনের খরচ হিসেবে সে আমার কাছে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা চায়। কিন্তু আমি এক লাখ ষাট হাজার টাকা দিতে রাজি হই। সে বলে যে আমাকে কক্সবাজারে যেতে হবে। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে যেতে হবে বার্মা। আমি রাজি হই। বার্মা পৌঁছানোর পর দালাল অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করল। আমার কাছ থাকা নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে নিল, জোর করে কেড়ে নিল ঘড়ি ও আংটি। আমরা প্রায় একশ জন লোক ছিলাম সেই জাহাজে।

আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সমুদ্রপথে এবং দশ দিন পর থাইল্যান্ডের উপকূলের অদূরে গিয়ে জাহাজ থামে। আমাদের সঙ্গে তখন যাচ্ছেতাই আচরণ করা হচ্ছিল। দিনে একবার খাবার দেওয়া হতো এবং তা মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না। আমার খুবই ইচ্ছা করত মাংস ও তাজা খাবার খেতে। যথাযথ পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য আমি কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছি। নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছিল। এক সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিদিন বেলা ৪টার পর সামান্য খাবার ও অল্প পানি দিত। ভিক্ষুকের চেয়েও খারাপ ছিল আমাদের অবস্থা। আমরা শুধু পরাধীন ছিলাম না মানুষের মৌলিক চাহিদা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল আমাদের। আমাদের সারা শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। নিজে থেকে পানি পানের চেষ্টা করলে আমাদের পেটানো হতো। কান্নাকাটি করলে তা রেকর্ড করে আমাদের পরিবারের কাছে পাঠানো হতো। তারা চাইত আমাদের প্রত্যেকের পরিবার দুই লাখ ৮০ হাজার করে টাকা তাদেরকে দিক।

দুই মাস ১৩ দিন পর আমার পরিবার জানতে পারে আমার ভাগ্যে কী ঘটেছে। তারা জমি ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে অর্থ পাঠানোর প্রস্তুতি নেয়। আরও তিন মাস দশ দিন পর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। এখন একটা ড্রাইভারের চাকরি সন্ধান করছি এবং চেষ্টা করছি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে।

বিকাশের মাধ্যমে মুক্তিপণ পাঠিয়েছি কিন্তু ভাইয়ের দেখা মেলেনি

রমিজ আলী

আমি রমিজ আলী। আমার ছোট ভাইয়ের নাম রাজু। সে ২০১৪ সালের মে মাসে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায়। কাজ থেকে সে আর বাড়ি ফিরে আসে নাই। নিখোঁজ হওয়ার দুমাস পর একটা অপরিচিত বিদেশি মোবাইল নম্বর থেকে ফোন আসে এবং একজন বাংলাদেশী এজেন্টের মাধ্যমে একটা বিকাশ একাউন্টে আড়াই লাখ টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তারা জানায় টাকা না দিলে রাজুর ওপর নির্যাতন চালানো হবে। এমনকি তারা রাজুকে হত্যারও হুমকি দেয়। আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না, কিন্তু তারপরও আমি জেনেশুনে আমার ভাইকে নির্যাতনের শিকার হতে দিতে পারি না। কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়েছিলাম চড়া সুদে ঋণ করতে। কারণ আমরা তো গরিব! আমাদেরকে তো আর ব্যাংক থেকে ঋণ দিবে না! আমরা এখনও জানিনা রাজুর ভাগ্যে কী ঘটেছে। আমার মা এখনও আঙিনায় বসে থাকে আমার ভাইকে ফিরে পাওয়ার আশায়!

তার টিফিন বক্স বাড়িতে এসেছিল কিন্তু সে আজও ফেরে নাই

আসগর আলী

আমার নাম আসগর আলী। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহদাতপুর গ্রামে আমার বসবাস। আমি একজন তাঁতি এবং এই কাজ করে কোনরকম আমাদের সংসার চলে। আমাদের যৌথ পরিবার। একদিন আমার ভাই কাজে গিয়ে আর ফিরে আসে না। কেউ একজন তার টিফিনবক্সটা আমাদের বাড়িতে এনে দিয়ে যায় এবং বলে আমার ভাই মালয়েশিয়া যাচ্ছে। এই প্রথমবার এরকম কিছু শুনলাম।

এরপর থেকে আমার ভাই সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাই না। এমনকি তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগও হয় না। প্রায় ৩০-৪০ দিন পর একটা অপরিচিত নম্বর থেকে টেলিফোনে আমার ভাই জানায় তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দালালকে টাকা না দিলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। মুক্তিপণ হিসাবে দালাল দুই লাখ বিশ হাজার টাকা চায়। তাদের দাবি অনুযায়ী চড়া সুদে আমরা ঋণ নেই এবং কিস্তি হিসাবে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করতে শুরু করি। তবে মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করার পর আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের আর কোনো কথা হয় নাই। আমরা কয়েকবার মুক্তিপণ গ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রতিবারই তাদের টেলিফোন বন্ধ পাওয়া গেছে।

আমার অপহৃত স্বামী শেষ পর্যন্ত জেলে গিয়েছিল

রহিমা বেগম

আমার নাম রহিমা বেগম। স্বামীর নাম সাইফুল। আমাদের একমাত্র ছেলের বয়স তিন বছর। আমাদের এলাকার মানুষের একমাত্র জীবিকা হলো তাঁত বোনা। আমার স্বামী সারাদিন কাপড় বুনে অল্পই আয় করত। একদিন সে দুপুরের খাবার না নিয়েই কাজে চলে যাচ্ছিল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, "আজ খাবারের প্রয়োজন নেই।" সেই সকালে আর কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে যায় এবং তারপর থেকে সে নিখোঁজ। আমরা জানিনা আসলে কী ঘটেছে! কিছুদিন পর আমরা ধারণা করি সে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে। কিন্তু কিভাবে, কার সাহায্যে এবং টাকাই বা কোথায় পেল কোনো কিছুই বুঝতে পারি নাই। একদিন অপরিচিত একটা নম্বর থেকে টেলিফোন আসে এবং দুই লাখ ২০ হাজার টাকা দাবি করে সাইফুলের মুক্তিপণ হিসাবে। আমি হতভম্ব হয়ে যাই এবং প্রতিশ্রুতি দেই অর্থের ব্যবস্থা করার। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। কয়েক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর সাইফুল টেলিফোনে আমাকে জানায় সে জেলে আছে। এখন সে কি অবস্থায় আছে তার কিছুই জানি না।

এমআরপিসি আমার মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল

হাসিনা বেগম

আমি হাসিনা বেগম। আমার স্বামীর নাম মোহাম্মদ হাসমত মিয়া। কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার জিংলাতলী গ্রামে আমাদের বাড়ি। স্বামী বাগানের মালির কাজ নিয়ে মালয়েশিয়া গিয়েছিল ১৯৯৭ সালে। দীর্ঘ সতের বছর সেখানে কাজ করার পর ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মালয়েশিয়াতেই হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। তার পাঠানো টাকায় আমাদের সংসার কোনোমতে চলতো। তার মৃত্যুতে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। এমনকি জানতাম না কিভাবে তার মৃতদেহ দেশে আনা সম্ভব হবে। স্বামী মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর আমি আমার গ্রামে "অভিবাসী অধিকার রক্ষা কমিটি" আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। সেখান থেকে জানতে পারি মৃত অভিবাসীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করার পাশাপাশি তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সরকারি কর্মসূচির কথা। এই আর্থিক সহায়তা ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্তও হয়ে থাকে।

তারপর জিংলাতলী এমআরপিসি কমিটির সদস্য রাশেদা বেগম আমাকে ডিইএমও কার্যালয়ে নিয়ে যায় এবং মৃতদেহ প্রত্যাবাসন ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আবেদনপত্র পূরণ করতে সাহায্য করে। ফলে ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আমার স্বামীর মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিইএমও কার্যালয় থেকে আমি তিন লাখ টাকার সরকারি সাহায্যের চেক সংগ্রহ করি। জীবনে কিছুটা স্বস্তি নেমে আসে। এই অর্থ পেয়ে আমার পরিবার উপকৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে আমার স্বামীর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে তা কখনই পূরণ হওয়া সম্ভব না।

দালালদের অনেক ক্ষমতা, তাদের ধরা আমার ক্ষমতার বাইরে

নবীউল ইসলাম মল্লিক

সিরাজগঞ্জ জেলার জামতলি গ্রামের বাসিন্দা আমি। আমার ছেলের বয়স আঠার বছর। বিদেশ যাওয়ার আগে সে ড্রাইভারের চাকরি করত। একদিন হঠাৎ ফোন করে বলে সে এখন চট্টগ্রামে এসেছে বিদেশ যাওয়ার জন্য। আমরা জানিনা সে কতদিনের জন্য বিদেশ যাচ্ছে এবং কিভাবে তা সম্ভব হলো। আমাদের গ্রামে কিছু ফেরত আসা অভিবাসী আছে যারা অভিবাসন সম্পর্কে বিভীষিকাময় বিভিন্ন গল্প বলেছে। একজন আমাকে বলেছিল তার ছেলে ট্রলারে করে বিদেশ যাওয়ার পর মারা গিয়েছিল। অন্যেরা বলেছিল তাদের ছেলেকে খাবার ও পানি দেওয়া হতো না। বরং মারধোর করাসহ বিভিন্ন রকম শারীরিক নির্যাতন করা হতো। এসব গল্প আমাকে সত্যিই ভীত করে তুলত এবং আমি ভাবতাম আমার ছেলের ভাগ্যে কী কী ঘটতে পারে। কয়েকদিন পর এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারলাম সম্ভবত দালাল হালিম আমার ছেলেকে বিদেশ যেতে সাহায্য করেছে। তারা আমাকে সতর্ক করে এই বলে যে হালিমের বিরুদ্ধে মামলা করে কোনো লাভ হবেনা। সরকারি পর্যায়ে তার ভালো যোগাযোগ আছে এবং তার বিরুদ্ধে কথা বললে আমরা আরও সমস্যায় পড়ব। আমি অন্যান্য সন্তানদের নিয়ে বেঁচে আছি। সব সময়ই ভাবি কী ঘটেছে আমার ছেলের জীবনে? কোনো কূলকিনারা পাই না!

পশুর সাথেও মানুষ এর চেয়ে ভালো আচরণ করে

তারেকুল

সৈয়দপুর জেলার এনায়েতপুর গ্রামে আমার বসবাস। আমার বয়স বাইশ বছর। বিদেশ যাওয়ার আগে আমি নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতাম। আমি ২০১৩ সালে গ্রামের এক লোক দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলাম, যে ছিল বিদেশ লোক পাঠানোর দালাল। বুড়া মিয়া নামের এই দালাল একদিন আমাকে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে। সে জানায় বদিউজ্জামান নামের এক লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যে খুবই ক্ষমতাবান। আমার তখন মনে হয় এসব যোগাযোগ চাকরির সুযোগকে সহজতর করবে। প্রথমে আমি ভাবি নাই যে, বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমার জন্য ভালো হবে। কিন্তু সে আমার সামনে অভিবাসনের চমৎকার ফলাফলের চিত্র তুলে ধরে এবং কীভাবে বিদেশ গেলে আমার জীবন বদলে যাবে তারও বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। এইসব লোভনীয় আলোচনা শুনে আমি বিদেশ যেতে রাজি হই।

একদিন দালাল আমাকে বলল যে কক্সবাজারে যেতে হবে। সেখানে যাওয়ার পর জানানো হলো আমরা ট্রলারে করে টেকনাফে যাব। টেকনাফে পৌঁছানোর পর দালাল জানায় আজকে জাহাজ চলে গেছে, সুতরাং আগামীকাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এ সময় থেকে শুরু হয় দুর্ব্যবহার করা। আমার হাত-পা বেঁধে ফেলা হয় এবং পরদিন সকালে জোর করে একটা জাহাজে তোলা হয়। সমুদ্রের বুকে অনেকগুলি দুর্দশাগ্রস্ত দিন কেটে যাওয়ার পর আমরা শেষ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে পৌঁছাই। তারপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে বাধ্য করা হয় এবং দৌড়ানো শেষে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রাখা হয় পাঁচদিন। আমরা প্রায় বিশ জন লোক

একসঙ্গে মাটিতে পড়েছিলাম ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত এবং যন্ত্রণাকাতর অবস্থায়। তারা আমাদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করছিল। মাঝে মাঝে এলোপাথাড়িভাবে খাবার ছুড়ে দিত আমাদের দিকে। এমনকি খাবার সময়ও আমাদের হাত বাধা থাকত। আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু খাবারই দেওয়া হত। অবশেষে একটা পিকআপ ভ্যান আসে আমাদেরকে তুলে নেওয়ার জন্য। হাত বাঁধা অবস্থায়ই আমাদেরকে তাতে ছুড়ে দেওয়া হয়। ফলে কেউ কেউ উলঙ্গ, কেউ অর্ধ–উলঙ্গ হয়ে যায়। খাবারের অভাবে সবাই ছিলাম পীড়িত এবং ভ্যানের উঠার পর ভ্যানের পেছন থেকে আমরা চিৎকার করে কেঁদেছিলাম কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নাই। যে নির্যাতন আমরা সহ্য করেছিলাম তা ছিল নরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। আমি কখনও চিন্তা করি নাই যে এরকম নির্যাতন সহ্য করতে হবে।

এমন সময় পুলিশ পাচারকারীদেরকে দেখে ফেলে এবং আমাদেরকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর পুলিশকে আমরা নিজেদের তথ্য জানাই এবং তারা তখন যোগাযোগ করে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে। আমাদের পরিবারগুলো প্রত্যাবাসনের খরচ প্রদান করলে আমরা দেশে ফিরে আসি। দেশে এসে জানতে পারি দালাল বুড়া মিয়া আমার পরিবারের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা বিকাশ একাউন্টের মাধ্যমে আদায় করে নিয়েছে। বহু কষ্টের পর বেঁচে ফিরেছি ঠিকই কিন্তু এখনও সেইসব দিনের ভয়াবহ যন্ত্রণার স্মৃতি ভুলতে পারি নাই।

অবৈধ পথে বিদেশ যাই কিন্তু আমার রোজগার ছিল খুবই ভাল

মোহাম্মদ সৈয়দ ইউসুফ

আমি কুমিল্লা জেলার আটিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। তিন ভাই, তিন বোন ও বাবা-মাকে নিয়ে আমাদের পরিবার। আমাদের কিছু কৃষিজমি আছে কিন্তু তা দিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটত না। আমার এক বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বড় ভাই কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করে এবং অন্য ভাইয়েরা লেখাপড়া করছে। আমি পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। এসএসসি পাশের পর আর লেখাপড়া করতে পারি নাই।

অনেক চেষ্টা করে অবশেষে মালয়েশিয়ায় একটা কাজের ব্যবস্থা করি। কিন্তু মালয়েশিয়া পৌঁছানোর পর একজন আমার পাসপোর্ট কেড়ে নেয় এবং বলা হয় আমার পাসপোর্ট আমি আর কখনই ফেরত পাবো না । তারপর একটা কাগজ ধরিয়ে দেয় যা ছিল সেখানে আমার মাত্র তিন মাসের কাজের অনুমতিপত্র। সেখানে আমি একটা প্লাষ্টিক সামগ্রী তৈরির কারখানায় কাজ করতাম, যারা কাপড় ঝোলানোর হ্যাঙ্গার তৈরি করে। কিন্তু এ ধরনের কাজের কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ফলে দক্ষ কর্মীদের দেখে দেখে কাজটা শিখে ফেলি। তারপরও আমার বেতন ছিল খুবই কম। ফলে দেশে কোনো টাকা পাঠাতে পারি নাই। যাই হোক, অল্প দিনের ভেতরে মালয়েশিয়ার ভাষা শিখে যাওয়ায় অন্য চাকরির সুযোগ আসে। এবার কাজ পাই একটা গ্যারেজে। এখানে কাজ করে আমার পরিবারকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পাঠাতে পারতাম। তবে সরাসরি টাকা পাঠাতে পারতাম না। কারণ আমার তিন মাসের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমি অনিয়মিত অভিবাসীতে পরিণত হয়েছিলাম। সে

কারণে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হতো। অবসর সময়ে বাইরে বের হতে পারতাম না। এভাবে পাঁচ বছর আমি মালয়েশিয়াতে কাটাই। আমার পরিবারের কাছে টাকা পাঠাতাম অন্য এক বাংলাদেশীর মাধ্যমে।

এই অর্থ দিয়ে আমার বাবা একটা বাড়ি করেছে। আমার ভাইবোনদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছে। আমি ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে বিয়ে করেছি। ছোটবোন এসএসসি পাশ করেছে এবং সবচেয়ে ছোট ভাই এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এখনও পরিবার আমার উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু ফিরে আসার পর থেকে আমি বেকার। তবে রামরুর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ড্রাইভিং শেখার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। ড্রাইভিং শিখে পরীক্ষা দেওয়ার পর একটা অভিজ্ঞতার সনদপত্র পেয়েছি। যদিও এখনও লাইসেন্স পাই নাই। লাইসেন্স পাওয়ার পর আমি দেশেও কাজ করতে পারব। আর যদি বাংলাদেশে চাকরি না পাই তাহলে কুয়েতে চলে যাব। সেখানে কর্মরত অনেক বাংলাদেশীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।

সিঙ্গাপুর

আমার মতো বোকামি আর কেউ করো না

মোহাম্মদ জাহিদ

আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ, বয়স ৩২ বছর। আমি কুমিল্লা জেলার ইলিয়টগঞ্জ উপজেলার বিটমান গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে কাজ করছি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা আটজন। বড় ও মেজ ভাই সৌদি আরবে বসবাস করত অভিবাসী হিসেবে। তারা দেশে ফিরে ব্যবসা করছে। দেশ ছাড়ার আগে আমি একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মাঠ সহকারীর কাজ করতাম। বেতন পেতাম মাসে ৭ হাজার টাকা যা দিয়ে সংসার চলত না।

এ অবস্থায় ২০১৫ সালে আমার গ্রামের এক দালালকে বিদেশে একটা কাজের ব্যবস্থা করার জন্য সাহায্য করতে বলি। আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার একটা সার্টিফিকেট প্রয়োজন, যা অভিবাসনে সাহায্য করবে এবং দালাল অঙ্গীকার করেছিল সে আমাকে তা যোগাড় করে দেবে। এজন্য সে আমার কাছে চার লাখ টাকা দাবি করে। পরে সে ডাক্তারি পরীক্ষা, ভিসা ফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য আরও চার লাখ টাকা দাবি করে। এছাড়া প্রশিক্ষণ ও যাওয়ার প্রস্তুতি জন্য কেনাকাটায় খরচ হয় আরও ৫০ হাজার টাকা। অর্থাৎ আমার অভিবাসনের খরচ সর্বমোট সাড়ে আট লাখ টাকা। এত টাকা একত্রিত করা আমার জন্য ছিল একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ করেছিলাম এবং পাঁচ লাখ টাকা ঋণ করেছিলাম চড়া সুদে। আমার অভিবাসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিল দুই বছর ছয় মাস।

সিঙ্গাপুরে এসে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। বেতন ছিল প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা। জীবনযাপনের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর পর খুব অল্প পরিমাণ টাকা আমি দেশে পাঠাতে পারতাম, ঋণ পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এক বছরের সুদসহ সামান্য কিছু ঋণ পরিশোধ করেছি মাত্র। সিঙ্গাপুরে আমার চাকরির চুক্তি বাকি আছে মাত্র দুই বছর। প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে চাকরি বদলাতে পারব। আমাকে একটা বেশি বেতনের চাকরি যোগাড় করতেই হবে। অন্যথায় ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। যদি ভালো চাকরি না পাই তাহলে কী করব আমি জানি না। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে নির্মাণশিল্পে চাকরির সম্ভাবনা মোটেও সুবিধাজনক নয়। অনেকেই কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। জানিনা আমার ভাগ্যে কী ঘটবে। একটা অনিশ্চিত সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমার স্বপ্ন ছিল বিদেশ গিয়ে চাকরি করে অনেক টাকা আয় করব এবং সাহায্য করব পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের। কিন্তু তার পরিবর্তে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে হতাশ জীবন যাপন করছি।

ভাগ্য প্রসন্ন হলে সাফল্য আসে দ্রুত

মল্লিক মিয়া

আমি টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার বাঞ্ছারামপুর গ্রামের বাসিন্দা। বর্তমানে বিদেশে কাজ করছি। দুই ভাই, বাবা, মা ও দাদাকে নিয়ে আমাদের সংসার। আমাদের সামান্য কৃষিজমি আছে। এ জমির আবাদে আমাদের সারা বছরের খোরাকী চলে না। এছাড়া কয়েকজন মিলে একটা রেস্টুরেন্ট করেছিলাম। সেখান থেকে যা আয় হতো তাও সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।

এ অবস্থায় ২০১৪ সালে ২৭ বছর বয়সে কাজের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর যাই। খরচ হয় পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। আমার মামা আমাকে সিঙ্গাপুরে যেতে সহযোগিতা করেছিল। সে বলেছিল আমি শিপইয়ার্ডে চাকরি পাব এবং বেতন দেওয়া হবে প্রতি মাসে ৫৫০ সিঙ্গাপুরি ডলার। অভিবাসনের খরচে সাহায্য হবে ভেবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম এবং বাকি অর্থ ঋণ করেছিলাম আত্মীয়-স্বজন ও মহাজনের কাছ থেকে। কিছু ঋণ নেওয়া হয়েছিল সুদে। সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পর বলা হলো এই চাকরির জন্য আমার আচরণ, সামর্থ্য, গুণাবলী ইত্যাদি দুই মাস ধরে পরীক্ষা করা হবে। দুই মাস পর নিয়মিত বেতন পেতে থাকব এবং দেশেও টাকা পাঠাতে পারবো।

এই কাজ করে দ্রুত আমার সব ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি। আমার ও পরিবারের আর্থিক অবস্থা এখন অনেক ভালো। আমাদের ৫০ ডেসিমেল কৃষিজমি ও একটা গরু আছে এখন। পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখন এই জমির ওপরে। ছোটভাই একটা সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিতে চলেছে। তার ইচ্ছা সরকারি চাকরি করার। সে আমার মতো কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যেতে আগ্রহী নয়। আমি ভাগ্যবান যে আমি বিদেশ গিয়ে লাভবান হয়েছি। আমার অর্থনৈতিক সাফল্য পরিবারকে আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে।

কেউ কি বলবেন দালাল ছাড়া কিভাবে অভিবাসন করা যায়?

মোহাম্মদ জামাল

আমি মোহাম্মদ জামাল এবং হস্তচালিত তাঁত-কারখানায় কাজ করতাম। আমার বাবা ইন্নাস আলী একটু সচ্ছল জীবনের আশায় আমাকে বিদেশ পাঠানোর চেষ্টা করে। স্থানীয় দালাল মোহাম্মদ লতিফ তা জানত। সে আরও জানত যে আমি আমার পাসপোর্ট তৈরি করেছিলাম। লতিফ বেশ কয়েকবার আমাকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর চেষ্টা করে। প্রতিশ্রুতি দেয় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার। সে বোঝায় যে ভালো বেতনসহ থাকার ব্যবস্থারও কোনো ত্রুটি হবে না। আমার বাবা তাকে বিশ্বাস করে। ২০১৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে তার কাছে আমার পাসপোর্ট, ২,৩০,০০০ হাজার টাকা ও বারো কপি ছবি দেয়া হয়। লতিফ অঙ্গীকার করে যে তিন মাসের ভেতরে সে আমাকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু বছর পেরিয়ে যায় আমি সিঙ্গাপুর যেতে পারিনা। শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের মধ্যস্ততায় সমঝোতার ব্যবস্থা করা হয়।

চেয়ারম্যান, লতিফ এবং আমি ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ একটা চুক্তিতে আসি এবং সেই অনুযায়ী লতিফ পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে আমার পুরো টাকা ফেরত দিতে রাজি হয়। কিন্তু এবারো সে ব্যর্থ হয়। আমরা লতিফের বাড়িতে গিয়ে টাকা চাইলে সে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করে এবং চিৎকার করে বলে তাকে কোনো টাকা দেওয়া হয় নাই। তাকে এ ধরনের আচরণ করতে দেখে আমার বাবা অবাক হয় এবং ২০১৫ সালের ২৫ মে চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের বিচারিক এখতিয়ার চেয়ারম্যানের না থাকায় তিনি নিয়মিত আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে রামরু'র কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমরা টাঙ্গাইল কোর্টে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করি। বর্তমানে টাঙ্গাইল কোর্টে মামলা চলছে। আমার আইনজীবী বলেছে মামলা নিস্পত্তি হতে সময় লাগবে। প্রত্যেকেই আমাদেরকে দায়ী করছে এই বলে যে কেন আমরা এভাবে দালালকে টাকা দিয়েছি। কিন্তু কেউ বলবেন দালাল ছাড়া কিভাবে অভিবাসন করা যায়?

মাইগ্রেন্ট হিসেবে যাই, আস্তে আস্তে হয়ে পরি রিক্রুটার

মোহাম্মদ সাইদুল

আমি কুমিল্লা জেলার চন্দ্রা গ্রামের অধিবাসী। রাইস মিলে শ্রমিকের কাজ করতাম। ১৯৮৭ সালে সিদ্ধান্ত নেই সৌদি আরবে কাজ করতে যাবো। সৌদি আরবে মাত্র বাইশ দিন ছিলাম। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় চাকরিদাতা কোম্পানি আমাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। দেশে ফিরে এসে আবার রাইস মিলে কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করতে থাকি বৈধ উপায়ে বিদেশ যাওয়ার। দ্বিতীয় বার অভিবাসী হই সিঙ্গাপুরে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে। সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন সেখানকার একজন দালালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল যে অন্যদেশ থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে। তার সাহায্য নিয়ে আমি বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিনশ লোককে সিঙ্গাপুরে নিয়ে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে ১১ বছর কাজ করে আমি দেশে ফিরে আসি।

দেশে ফিরে প্রথমে মাছচাষের একটা প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিলাম। এখন আমি নিজের পুকুর ছাড়া আরও ১৪টি পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করছি। এ সময় হঠাৎ করে মাছের খাবারের একটা ব্যবসা চালু করার চিন্তা মাথায় আসে। বর্তমানে আমার এলাকায় মাছের খাবার উৎপাদনের একটা কারখানা স্থাপন করেছি। একই সঙ্গে শুরু করেছি ট্রাক এবং ট্রাক্টরের ব্যবসা। আটটা পিক-আপ ভ্যান ও একটা ট্রাক্টর রয়েছে আমার। প্রায় ২৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে আমার ব্যবসায়। ব্যবসা আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে, করেছে স্বপ্ন পূরণ। এলাকার লোকেরা এখন আমাকে দক্ষ ও সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চেনে।

ব্রুনাই

পরকিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়

রুবেল

আমার নাম রুবেল। বরিশাল জেলায় ১৯৮৩ সালে আমার জন্ম। পুরো ছেলেবেলাটাই আমি গ্রামে কাটিয়েছি। আমি পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা আটজন। বাবা একজন কৃষক এবং মা গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ করে থাকে। আমার বড় ভাই পনেরো বছর আগে ব্রুনাই-এ কাজ করতে যায়। তার স্ত্রী এবং ছেলে আমাদের সঙ্গে বসবাস করে। ব্রুনাই যাওয়ার পর ভাইয়ের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হয় নাই। তার ছেলে বর্তমানে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং ছাত্র হিসেবে সে মেধাবী। আমার ভাই নিয়মিত রেমিটেন্স পাঠায়। আমরা তার পরিবারের দেখাশোনা করছি। শুনেছি আমার ভাই ব্রুনাইতে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং সে কারণে সে বাংলাদেশে আসে না।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন

জাপান

আজ আমি দশ জনের একজন

মোহাম্মদ আবদুল আমীন

আমার প্রতিবেশীদের অনেকেই কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়ে সফল হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমার পরিবারও আমাকে বিদেশ যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেবেছিলাম আমাদের জীবন ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা হবে একটা চমৎকার সুযোগ। পরিবারের সহযোগিতায় ১৯৮৬ সালে জাপান যাই। দীর্ঘ ১৩ বছর পর ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং তখন আমি একজন বদলে যাওয়া মানুষ। ফিরে আসার পর গ্রামের অন্যান্য লোকদেরকে কাজের উদ্দেশ্যে জাপান যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রচুর সময় ব্যয় করতে থাকি। এ কাজ আমাকে আনন্দ দেয় এবং তারাও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জীবনে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই। এলাকায় অনেকেই আমার সাফল্যের জন্য আমাকে শ্রদ্ধা করে। এছাড়াও এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য আমার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রামরু আমাকে 'সোনার মানুষ' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। আমার অভিবাসন ভালো পরিকল্পনা ও রেমিটেন্সের সঠিক ব্যবহারের সাফল্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আমি আমার গ্রামবাসীর জন্য ১৫ শয্যাবিশিষ্ট একটা হাসপাতাল চালু করেছি। নির্মাণ করেছি একটা বিপণিকেন্দ্র। পাশাপাশি ষোল গণ্ডা জমিও কিনেছি। পরিকল্পনা করছি আগামী বছর একটা প্লাস্টিক কারাখানা চালু করার। যদি পরিকল্পনা সফল হয় তাহলে এলাকার লোকের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দান দান তিন দান

মোহাম্মদ সেলিম মিয়া

কুমিল্লা জেলার কুশিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা আমি। একজন সাহসী মানুষ হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সব সময় প্রস্তুত ছিলাম। লেখাপড়া শেষ করে কাজের উদ্দেশ্যে তাইওয়ান গিয়েছিলাম। সেখানে কাজের তেমন সুবিধা না হওয়ায় নয় মাস পর দেশে ফিরে আসি। কিন্তু দেশে ফিরে এসে কোনো কাজ না পাওয়ায় আবার চেষ্টা করি বিদেশ যাওয়ার। এবার যাই সিঙ্গাপুরে। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হই। পর পর দুবার ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশেই একটা ব্যবসা শুরু করি। চার বছর ব্যবসা করার পর আমি আবার সিদ্ধান্ত নেই বিদেশ যাওয়ার এবং ১৯৯৮ সালে জাপানে চলে যাই। সেখানে আমি টয়োটা গাড়ির কারখানা ও ঘড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করেছি। জাপানে আট বছর কাজ করার পর দেশে ফিরে আসি। ফিরে এসে নিজের জমিতে মাছ চাষের একটা প্রকল্প চালু করি। আমি উপলব্ধি করি যে, দাউদকান্দি এলাকায় প্রচুর মাছ

পাওয়া যায়। এখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মাছ পাঠাতে হলে প্রচুর পরিমাণ বরফের প্রয়োজন। সুতরাং, এখানে একটা বরফ কল স্থাপন করা জরুরি। একথা ভেবে বাজার এলাকায় রাস্তার পাশে কিছু জমি কিনলাম এবং প্রতিষ্ঠা করলাম একটা বরফ কল। এটা এখন একটা সফল ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আমার এই বিনিয়োগের কারণে দারুণ উপকৃত হয়েছে এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ীরা।

ভাষা শেখার পর সবকিছুই বদলে গেল

আবদুস সালাম

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর গ্রামে আমার বসবাস। আমি ১৯৯৫ সালে এসএসসি পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। সবকিছুই তখন আমার পরিবারের জন্য কষ্টকর ছিল। এমনকি নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটানোও ছিল কঠিন কাজ। দেখতাম আমার বাবা কী অমানুষিক পরিশ্রম করে সংসার চালাচ্ছে। তারপরও পরিবারের প্রয়োজন মেটেনা। তাই টাকা উপার্জন করতে জাপানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল ১০ লাখ টাকা। কিছু সম্পদ বিক্রি করে ও কিছু ঋণ নিয়ে এ টাকা জোগাড় হয়েছিল। যেহেতু জাপানি ভাষা না জানায় বেশ কিছুদিন ভালো কোনো কাজ পাই নাই। আস্তে আস্তে ভাষাটা শিখি এবং ওয়েল্ডার হিসেবে একটা কাজ পেয়ে যাই। প্রথম দিকে ব্যাংকের নিয়ম-কানুন না বোঝার কারণে বৈধভাবে রেমিটেন্স পাঠাতে পারতাম না। ফলে তা পাঠাতাম অবৈধভাবে। পরবর্তীতে জাপানী ভাষা বুঝে যাওয়ার পর ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাঠাতে থাকি। আমার পরিবারের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে ছোট ভাইকে আমার টাকা দিয়ে ইটালি পাঠিয়েছি এবং আমার পরিবার ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে একটা দোকান কিনেছে। গ্রামে একটা নতুন বাড়ি বানানো হয়েছে। আমি ২০০৮ সালে দেশে ফিরে আসি। শ্রীনগরের নতুন বাড়িতে আমার পরিবারকে একত্রে বসবাস করতে দেখে খুব ভালো লাগে। এখন আমাদের উপার্জন আসে ঢাকার দোকান থেকে এবং গ্রামের বাড়িতে মাছ চাষ করে। অভিবাসনের সাফল্যে আমি পুরোপুরি তৃপ্ত। কাজের উদ্দেশ্যে আমার আর বিদেশ যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই।

রাতে আমি ঘুমাতে পারি না

চৌধুরী এইচ. এম. মনোয়ার

আমি হলাম বহু অভিবাসনের একটা কাহিনী। আমার বয়স ৪৬ বছর। বাইশ বছর বয়সে কাজের উদ্দেশ্যে কাতার গিয়েছিলাম। তারপর অভিবাসী হয়েছিলাম মালয়েশিয়া, সৌদি আরব এবং সবশেষে জাপানে। আমার পরিবারের ২০ ডেসিমেল জমি ছিল। বাবা ও অন্যান্য বংশধরেরা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্ভরশীল ছিল এই জমির ওপর। আমি ভাবতাম এসব জমি দেখাশোনা করবে আমার ভাইয়েরা, আর আমি অতিরিক্ত টাকা আয় করব বিদেশে চাকরি করে।

আমার অভিবাসনের প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল কাতারে। দুঃখজনকভাবে, সেটি আমার জন্য কোনো ভালো অভিজ্ঞতা ছিল না। দালাল আমাকে কাতারে পাঠিয়েছিল ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়ে। সুতরাং পৌঁছানোর পর আমি কোনো ভালো কাজ পাই নাই। কয়েক মাস পর পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। তারপর দেশে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় দুই বছর গ্রামে কাটানোর পর কাজের উদ্দেশ্যে এবার মালয়েশিয়া যাই। আমার এক বন্ধু বলেছিল মালয়েশিয়া কাজের জন্য একটা চমৎকার জায়গা। সেখানে কাজ পেয়েছিলাম কিন্তু কাজের পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। স্থানীয় তামিলরা আমাদের কাজের ব্যবস্থাপনায় ছিল এবং তারা মারধোর ও গালিগালাজ করত। আমরা জোরালো অভিযোগ করলেও কর্তৃপক্ষ তা কানে তুলত না। কিন্তু আমি আর সেই পরিবেশ সহ্য করতে পারছিলাম না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দেশে ফিরে আসার। মালয়েশিয়ার পর কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম সৌদি আরবে। কাজও পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও কাজের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত খারাপ। ফলে দেশে ফিরে আসি।

অবশেষে ২০১৩ সালে আমি জাপানে যাওয়ার একটা সুযোগ পাই। সেখানে গিয়ে কাজও পেয়ে যাই দ্রুত। প্রতি মাসে বেতন পেতাম ২০ হাজার টাকা। বৈধভাবে তখন দেশে নিয়মিত রেমিটেন্স পাঠাতাম। কিন্তু দুই বছরের বেশি জাপানে থাকার অনুমতি পেলাম না। সে কারণে দেশে ফিরে আসতে হল। অভিবাসনের মাধ্যমে আমি কখনও অর্থ সঞ্চয় করতে পারি নাই এবং পারি নাই ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনা করতে। এখন কোনমতে দিন চলে যায়। আমাদের তিন রুমের একটা ছোট বাড়ি আছে যার মেঝে পাকা ও ছাদ টিনের। তবে বিদ্যুৎ আছে। কৃষিজমি থেকে মাসে দুই হাজার টাকা উপার্জন হয়। আমার দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে মাহামুদ একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। ছোট ছেলে খালেদ দশম শ্রেণির ছাত্র। মেয়ে বিবি মরিয়মের বয়স নয় বছর। সে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তাদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বড় ছেলের শারীরিক পরিচর্যার জন্যও অনেক টাকা খরচ করতে হয়। তার ওপর রয়েছে বিশাল ঋণের বোঝা। এখনও আমার ছয় লাখ টাকা ঋণ রয়েছে। আমি রাতে ঘুমাতে পারিনা ঋণের কথা ভেবে, যা আমাকে পরিশোধ করতেই হবে।

কোরিয়া

এখন আমার বাবাকে আর রিক্সা চালাতে হয় না

রুহুল আমীন

লক্ষ্মীপুর জেলার দিঘলদী গ্রামে আমার বাড়ি। ছোট বেলায় বাবাকে দেখেছি রিক্সা চালাতে। আমাদের পাঁচ সদস্যের পরিবারে বাবাই ছিল একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। অল্প বয়সে স্বপ্ন দেখতাম একদিন ধনী মানুষে পরিণত হব। কিন্তু বড় হয়ে বুঝলাম যে চাকরি পাওয়া সহজ না। আমার এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই যারা ভালো চাকরি করে এবং চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে।

এসব সমস্যা সত্ত্বেও আমার পরিবার মোকাবেলা করছিল অর্থ সমস্যা, যার সঙ্গে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত। তখন একটা পরিকল্পনা মাথায় আসে। আমি খবরের কাগজে দেখেছিলাম যে কোরিয়ান ভাষা শিখে কেউ চাইলেই কোরিয়া যেতে পারে। আমি সিদ্ধান্ত নেই ভাষাটা শেখার। কোরিয়ান ভাষা মোটেও সহজ নয়। আমার কাছেও তা বেশ কঠিন মনে হলো। তারপরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনেক সময় ব্যয় করে ভাষাটা রপ্ত করতে চেষ্টা করলাম এবং কোরিয়ায় একটা চাকরির জন্য বোয়েসেলে আবেদন করলাম। ভেবেছিলাম আমার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু যখন দেখলাম আমার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে তখন নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। তখন আমার একমাত্র সমস্যা ছিল ভিসার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা। ফলে চেনাজানা সবার কাছেই গিয়েছি-আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু। তাদের কাছেই কোরিয়া যাওয়ার খরচ তিন লাখ ৫০ টাকা জোগাড় করেছি। কোরিয়ায় আমার চাকরিদাতা কোম্পানি খুবই ভালো ছিল। আমার বেতন ছিল এক লাখ ৫০ হাজার টাকা, সাথে ওভারটাইমের টাকাও পেতাম। সে কারণে প্রতিমাসে এক লাখ টাকা রেমিটেন্স পাঠাতাম। এখন আমার বাবাকে আর রিক্সা চালাতে হয় না, বোন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারছে এবং আমরা একটা নতুন বাড়ি বানিয়েছি। ভবিষ্যতেও আমি আমার পরিবারকে সাহায্য করব। দেশে ফিরে একটা ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দেখি।

দুটো অভিবাসন অভিজ্ঞতাই সুখের

মোহাম্মদ আজহার

আমি টাঙ্গাইলের পাঁচবিহার গ্রামের অধিবাসী। পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলার জন্য ১৯৯৮ সালে লিবিয়ায় গিয়েছিলাম কাজের উদ্দেশ্যে। তখন কিছু জমি বিক্রি করতে হয়েছিল এবং কিছু অর্থ আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করেছিলাম। অভিবাসনের চুক্তি অনুসারে আমি লিবিয়াতে চাকরি পেয়েছিলাম এবং বেতন নিয়মিত পেতাম। প্রতি মাসে উপার্জন থেকে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে ঋণ পরিশোধ করতাম। কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষ আমার কাজে খুশি হওয়ায় অফিসে আমার পদোন্নতি হয়। লিবিয়াতে আমি পাঁচ বছর কাজ করেছিলাম এবং উপার্জিত অর্থ আমার পরিবার চলতো। একই সঙ্গে আমি ১০ লাখ টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছিলাম। এই অর্থ দিয়ে ৩৩ ডেসিমেল জমি কিনেছি এবং গ্রামের বাড়িটা সংস্কার করেছি।

দ্বিতীয়বার কাজের উদ্দেশ্যে আমি দক্ষিণ কোরিয়ায় গিয়েছিলাম স্থানীয় রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে। দেশ ত্যাগের আগে টাঙ্গাইলের একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোরিয়ান ভাষা কোর্স সম্পন্ন করেছিলাম। চাকরি পেয়েছিলাম দক্ষিণ কোরিয়ার একটা কোম্পানিতে সুপারভাইজার হিসেবে। সৎ মানুষ হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করেছি সেখানে। অল্প দিনের ভেতরে আমার বেতন বেড়েছিল। কারণ আমার চাকরিদাতা দেখত আমি কী পরিমাণ পরিশ্রম করি! আমার কোম্পানি আমাকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করেছিল। এই কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমার গ্রামের কিছু লোকের দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমার বেতন ছিল মাসে এক লাখ টাকা। বেতনের বেশি অংশটাই দেশে পাঠাতাম। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ফিরে আসার পর আমি বাড়িটা সম্প্রসারণ করেছি এবং একটা গাড়ি কিনেছি। এখন একটা সিএনজি ফিলিং স্টেশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছি টাঙ্গাইলে বিশ্ব রোডের কাছাকাছি। যদি ফিলিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে স্থানীয় কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

বিদেশে ঠেলায় পড়ে মনোযোগী হয়েছি, আজও তার ফল পাচ্ছি

মোহাম্মদ মুস্তাক ইসলাম

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের বাসিন্দা আমি। এক রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে ১৯৮০ সালে কোরিয়ান বহুজাতিক সংস্থা হুন্দাই-এর প্রকৌশল বিভাগে একটা চাকরি যোগাড় করেছিলাম। কোম্পানি ব্যবস্থা করেছিল আমার থাকা ও খাওয়ার। ভালো বেতন পেতাম এবং ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে নিয়মিত টাকা পাঠাতাম। হুন্দাই কোম্পানিতে তিন বছর কাজ করার পর আমি দেশে ফিরে আসি।

কয়েক বছর দেশে থাকার পর আবার কাজের উদ্দেশ্যে যাই সৌদি আরবে কিন্তু সেখানে কাজ করি এক কোরিয়ান কোম্পানিতে। কোরিয়ান ভাষায় দক্ষতা চাকরিতে আমার অবস্থান নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল। এই কোম্পানি ভালো বেতন দিত এবং অন্যান্য সুবিধাও পেতাম। দেশে টাকা পাঠাতাম নিয়মিত। সাত বছর পর দেশে ফিরে এসেছি। পরিকল্পনা করছি ব্যবসা শুরু করার। মির্জাপুর বাজারসংলগ্ন এলাকায় নয় লাখ টাকা দিয়ে ৬০ ডেসিমেল জমি কিনেছি। এই জমির বর্তমান মূল্য এক কোটি টাকা। আমি জমিতে অর্থ বিনোয়াগ করেছি। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি জমি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। জমির মালিকানা আমার মনে একরকম আবেগ তৈরির করে। এছাড়া আরও একটি কারণ রয়েছে তা হলো জমি থেকেই সবচেয়ে বেশি লাভ আসে। বিপদ আপদে ভালো দামে বিক্রিও করা যাবে। আমার অন্য কোনো ব্যবসায়ের বিনিয়োগ মূল্যায়ন করা হবে না। অবশ্য অন্যান্য উদ্যোগেও আমি বিনিয়োগ করেছি। যেমন, মোবাইল ফোনের একটা শোরুম চালু করেছি এবং মির্জাপুরে গ্রামীণ ফোনের পরিবেশকের দায়িত্ব পেয়েছি। এছাড়া সমগ্র মির্জাপুরে অটবি ফার্নিচারের একমাত্র পরিবেশকও এখন আমি। আমার সব ব্যবসাই ভালো চলছে। বিদেশ থাকাকালীন শুধু অর্থ উপার্জনই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সে সময় আমি আরও শিখেছিলাম সাফল্য অর্জনের জন্য কীভাবে একটা বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয় এবং নেতৃত্ব দিতে হয়। বর্তমানে আমি দেশের একজন সফল শিল্প উদ্যোক্তা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ায় অভিবাসন

ভারত

দিল্লিতে কাজ করে আমি সুখি

ডালিয়া

আমি, আমার স্বামী এবং তার পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতাম। প্রথম অবস্থায় কৃষিজমি থেকেই আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হতো। আমার স্বামীর অন্যান্য ভাইয়েরা বিয়ে করার পর প্রত্যেকেরই যখন সন্তান হয় তখন তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। একদিন এক লোক এসে বলে কম বয়সী স্বামী ও স্ত্রীদের জন্য তার কাছে কাজের ব্যবস্থা আছে। সে সময় আমাদের গ্রামে নারীদের জন্য কোনো কাজই মিলতো না। সুতরাং আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করি। কিন্তু দেশে রেখে যেতে হয় তিন বছরের কন্যাকে। আমরা কাজের জন্য গিয়েছিলাম নতুন দিল্লিতে।

আমরা ২০০১ সালে দিল্লিতে এলাম এবং পরিচয় হলো এক প্রতিবেশীর সঙ্গে যে আমাদেরকে পেট্রল পাম্পের কাছাকাছি ৮ ফুট বাই ১০ ফুট একটা ঝুপড়ি ঘরে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। সেই ঘরের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল বাঁশের ফ্রেমের সঙ্গে প্যাকিং বাক্স জোড়া দিয়ে এবং ছাদ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছিল পলিথিন। আমাদের দালাল আমার স্বামীকে বর্জ্য কুড়ানোর চাকরি দেয় এবং আমি খন্ডকালীন গৃহস্থালির কাজ করতে শুরু করি। ঘরভাড়া দিতে হতো প্রতি মাসে ৫০০ ভারতীয় রুপী। আমি আলাদা আলাদা ছয়টি বাড়িতে কাজ করতাম। আমার দিন শুরু হতো ভোর সাড়ে ছয়টায়। আমি বাসনকোসন ধোয়ার কাজ শেষে নাস্তা বানাতাম। তারপর যেতাম অন্য বাড়িতে। সেখানে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও ঘর মোছার পর কাপড় ধুতে হতো। এসব কাজ করতে করতে বেলা এগারোটা বেজে যেত। তারপর আমি নিজের বাড়িতে আসতাম খাবার তৈরি করতে। বিকেল চারটায় আবার কাজ করতে যেতাম। আমি উপার্জন করতাম মাসে তিন হাজার ভারতীয় রুপী এবং আমার স্বামীর রোজগার ছিল মাসে প্রায় আড়াই হাজার ভারতীয় রুপীর মতো। এভাবে দিন ভালোই কাটতো। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা ছিল ঝুপড়িঘরে মাঝেমাঝেই পুলিশ হানা দিতো। আগে আমরা অন্য জায়গায় বসবাস করতাম। একদিন পুলিশ এসে বলে আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। তারা আমাদের ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এখানে আসার পর আমি আরও একটা কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছি। অবশ্য আমি তাকে বাংলাদেশে আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় মেয়েটি এখন স্কুলে যাচ্ছে এবং ছোটটাও খুব তাড়াতাড়ি স্কুলে যেতে শুরু করবে। যদিও গ্রেফতার হওয়ার ভয় আছে এবং আমি সন্তানদের

থেকে দূরে থাকি, তারপরও দিল্লিতে থাকতে আমি পছন্দ করি। আমার মা আমার সন্তানদের দেখাশোনা করে আর আমি সাধ্যমতো টাকা পাঠাই তাদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার জন্য।

চাকরিদাতারা ভালো ব্যবহার করে কিন্তু তারা আমাদের বিশ্বাস করে না

পরীমন বিবি

আমি এবং আমার স্বামী কাজের উদ্দেশ্যে দিল্লিতে গিয়েছিলাম পাঁচ বছর আগে এবং সেটা ছিল ২০০০ সাল। আমাদের গ্রামের বেশ কিছু মানুষ দিল্লিতে বসবাস করত। সুতরাং আমাদের পাশের বাড়ির দম্পতি যখন ছুটিতে বাংলাদেশে এলো তখন তাদের কাছে জানতে পারলাম যে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কাজ পাওয়া যায়। যেমন গৃহকর্মীর কাজ, আবর্জনা কুড়ানো, বাসের হেলপার, হোটেলের বেয়ারা, ইত্যাদি। এসব শুনে আমার স্বামী দিল্লি যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের কাছে জানতে চায় আমরা যেতে পারব কিনা। তারা আমাদের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করার পর শেষ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়। বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে যেতে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ব্যবহার করতে হয় রিক্সা, বাস, ট্রেন ইত্যাদি। সেখানে পৌঁছানোর পর আমাদের প্রতিবেশী কাজ পেতে আমাদেরকে সাহায্য করে। আমি চারটা বাড়িতে প্রায় একই ধরনের কাজ করতে শুরু করি; বাসনকোশন ধোয়া, ঝাঁট দেওয়া এবং ঘর মোছা। সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করতাম এবং প্রতি মাসে উপার্জন করতাম দুই হাজার চারশ ভারতীয় রুপী। আমার স্বামী সাইকেল মেকানিকের কাজ করে পেত আড়াই হাজার ভারতীয় রুপী। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সে গাড়ি ধোয়ার কাজও করত। আমরা প্রায়ই ঠিকানা বদল করতাম। এক বছর আগে আমরা হরাইজোন বস্তিতে বসবাস করতাম কিন্তু কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে তা ভেঙে ফেলে। তারপর আমরা হরাইজোন কোয়ার্টারে চলে আসি। আমাদের বর্তমান বাড়ি ভাড়া মাসে এক হাজার ভারতীয় রুপী। ভাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ আমি উপার্জন করি না এবং দেশেও রেমিটেন্স পাঠাতে পারি না।

কোনো ধরনের যৌন হয়রানির অভিজ্ঞতা আমার নেই। যেহেতু চাকরিদাতার বাড়িতে থাকিনা সুতরাং হয়রানির সম্ভাবনা কম। তাছাড়া গৃহকর্মীর চাহিদা থাকায় কোনো বাড়িতে কারও আচরণ সন্দেহজনক মনে হলেই কাজ করা বন্ধ করে দেই। কিন্তু চাকরিদাতারা আমাদের বিশ্বাস করে না। একবার এক বাড়িতে টাকা হারিয়ে যায় এবং তারা আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যায়। আমার স্বামী মোটা অঙ্কের অর্থ ঘুষ দেওয়ায় পুলিশ আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

পুলিশ আমাদের ঝুপড়িগুলোকে আগুন লাগিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়

খুশি

নয় বছর আগে ১৯৯৬ সালে আমি কাজের উদ্দেশ্যে ভারতে গিয়েছিলাম। কুমিল্লা জেলায় আমার বাড়ি। প্রতিবেশী গ্রামের এক লোককে বিয়ে করে সুখী জীবন যাপন করছিলাম। আমাদের দুটি ছেলে সন্তান। কিন্তু স্বামী সব সময় চায় একটা মেয়ে হোক। এ সময় আমাদের গ্রামের এক লোক বলে যদি আমরা আজমীরে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনের ওরশের সময় 'গিট'

বাঁধি তাহলে অবশ্যই আমাদের কন্যা সন্তান লাভ করার সৌভাগ্য হবে। সুতরাং আমরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে ঘুষ দিয়ে এবং এক দালালের সাহায্য নিয়ে আজমীর গেলাম।

আজমীরে 'গিট' বাঁধা শেষে ফিরে এলাম কিন্তু কন্য সন্তানের মুখ দেখলাম না। স্বামীর মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটল এবং বদলে গেল তার দৃষ্টিভঙ্গি। সে মদ্যপান করতে শুরু করল এবং তার আসক্তির কারণে আমরা জমিজমা হারালাম। এক পর্যায়ে স্বামী এতটাই উন্মাদ হয়ে ওঠে যে ছেলে দুটোকে আমার কাছ থেকে আলাদা করে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আজমীরে যাওয়ার সময় বাংলাদেশের কিছু লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল যারা সেখানে গিয়েছিল। নিজেকে তখন টিকিয়ে রাখার অন্য কোনো উপায় না থাকায় আমি আবার আজমীরে যাই। এক বছর পর দিল্লিতে কাজের সুযোগ সম্পর্কে শুনলাম সেইসব বাংলাদেশীর কাছে যারা সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল। আমিও সে সুযোগ গ্রহণ করি এবং বর্তমানে দিল্লিতে বসন্তকুঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করছি যেখানে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষেরা বসবাস করে। আমি পাঁচটা বাড়িতে কাজ করি এবং মাসে আড়াই হাজার ভারতীয় রুপী আয় করি। এই উপার্জনে জীবন চালানো কঠিন। বহুদিন হয়েছে নতুন কাপড় কিনতে পারি না। দিওয়ালির সময় সাধারণত কিছু কাপড় পেয়ে থাকি, তবে তার জন্য চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থা ভালো না। গ্যাস্ট্রিক-এর সমস্যায় ভুগছি দীর্ঘদিন থেকে এবং এর চিকিৎসা করানোও আমার পক্ষে কঠিন। এছাড়া সম্প্রতি ঝুপড়িতে পুলিশি হামলার সময় আমি আহত হয়েছি। তারা আমাদের উচ্ছেদ করতে এসেছিল। আমি মরিয়া হয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম কিন্তু পুলিশ মোটেও সময় নষ্ট করে নাই। তারা ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং আমাকে লাঠি দিয়ে পেটায়।

সন্তানেরা সাথে থাকায় রেমিটেন্স পাঠাতে হয় না

রেণু বালা বর্মন

আমি রেণু বালা বর্মন। সাত বছর আগে ১৯৯৮ সালে স্বামীসহ কাজের উদ্দেশ্যে দিল্লিতে গিয়েছিলাম। আমরা খুলনা জেলার অধিবাসী। প্রথম যখন দিল্লিতে যাই তখন আমার বয়স সবেমাত্র বাইশ বছর। আমার এক মামা দিল্লিতে বসবাস করত। কোনো এক ছুটিতে সে গ্রামের বাড়িতে আসে। সে সময় সিদ্ধান্ত নেই দিল্লিতে যাওয়ার। সন্তান দুটিকে গ্রামের বাড়িতে রেখে যাই কিন্তু তিন বছর আগে তারাও আমাদের কাছে চলে আসে। আমরা চারজন বর্তমানে এক সঙ্গেই থাকি। প্রথমে আমরা হরাইজোন বস্তিতে থাকতাম কিন্তু কয়েক মাস আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তা ভেঙে ফেলেছে। তারপর আমরা হরাইজোন কোয়ার্টারে চলে আসি। এটা আগের বস্তির চেয়ে অনেক ভালো। ঘরের আয়তন দশ ফুট বাই দশ ফুট। ভাড়া প্রতি মাসে এক হাজার দুশ ভারতীয় রুপী। আরও ছয়টি পরিবার এই কোয়ার্টারে বসবাস করে। আমি চারটি বাড়িতে কাজ করি এবং প্রত্যেক বাড়িতেই কাজের ধরন প্রায় একই রকম- রানাবান্না, ধোওয়া-মোছা এবং পরিচ্ছন্নতার কাজ। সাপ্তাহিক ছুটি অথবা অন্যান্য ছুটির দিনেও কাজ থেকে ছুটি নেই না। আমার স্বামী বাসের ড্রাইভার। আমি প্রতি মাসে আড়াই হাজার ভারতীয় রুপি উপার্জন

করি এবং স্বামী রোজগার করে মাসে তিন হাজার ভারতীয় রুপী। আগে দেশে টাকা পাঠাতাম কিন্তু এখন সন্তানেরা কাছে থাকায় আর পাঠাতে হয় না। তাছাড়া পাঠানোর মতো অতিরিক্ত অর্থও আমরা উপার্জন করতে পারি না। ইচ্ছা হলে আমি অন্য কাজও খুঁজে নিতে পারি। কিন্তু বর্তমানে যা আয় হয় তা দিয়ে নিজেদের চলে যাচ্ছে।

যদিও শহুরে জীবন উপভোগ করি তবু সারাক্ষণ থাকি পুলিশের ভয়ে

মর্জিনা

আমাদের গ্রামের এক প্রতিবেশীর সাথে আমি ও আমার স্বামী কাজের উদ্দেশ্যে দিল্লি এসেছি তিন বছর আগে। বরিশাল জেলার অধিবাসী আমরা। অভিবাসনে খরচ হয়েছিল প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা। গ্রামে আমাদের অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না তাই সিদ্ধান্ত নেই অভিবাসনের। স্বামী একাই রোজগার করত। গ্রামে মেয়েদের জন্য কোনো কাজ ছিল না। গ্রামের এক প্রতিবেশী আমাদেরকে উৎসাহিত করে দিল্লি যাওয়ার জন্য। সে আরও জানায় যে আমাদের দুজনের জন্যই সে কাজের ব্যবস্থা করবে। আমার স্বামী ইচ্ছা করলে আর্বজনা কুড়ানোর কাজ করতে পারবে এবং আমার জন্য পাওয়া সহজ হবে গৃহস্থালির কাজ। দিল্লির এক লোকের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিবেশীর যোগাযোগ ছিল, যে কাজের জন্য লোক খুঁজছে। তার কথা শুনে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করি। প্রতিবেশী আরও বলে আর্বজনা কুড়ানোর কাজে আমার স্বামীকে একটা সাইকেলভ্যানও দেওয়া হবে। দিল্লি পৌঁছানোর পর চাকরিদাতা একটা পেট্রল পাম্পের পাশের বস্তিতে থাকতে আমাদেরকে সাহায্য করে। স্বামীর সঙ্গে বসবাস করার পরও ভয়ে ভয়ে থাকি। শুনেছিলাম বস্তি থেকে খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। একবার কাছাকাছি এক বস্তিতে পুলিশি হামলা হতে দেখেছিলাম। আমার কয়েকজন প্রতিবেশীকে বস্তি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশী সন্দেহ করে। প্রায় সময়ই পুলিশ নিষ্ঠুর আচরণ করে। তারা জানত আমার প্রতিবেশীরা ভারতীয় নয় যদিও তাদের রেশন কার্ড ছিল।

মালদ্বীপ

ক্রমাগত চাকরি বদলিয়েছি আর বেতন বাড়িয়েছি

মোহাম্মদ আবদুর রব্বানী

আমি কুমিল্লার দাউকান্দি উপজেলার কুশিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা। বয়স ৪৯ বছর। আমি একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। অভিবাসনের আগে আমার একটা ক্ষুদ্র ব্যবসা ছিল। কিন্তু উপার্জন এতই অল্প ছিল যে পরিবারে জন্য তা যথেষ্ট নয়। বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেন পরিবারের জন্য ভালো কিছু করতে পারি। প্রথমে মালদ্বীপে গিয়েছিলাম ১৯৯৪ সালে ২৭ বছর বয়সে। খরচ হয়েছিল ৪০ হাজার টাকা। এই অর্থ যোগাড় করেছিলাম বাড়ি বিক্রি ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করে। মালদ্বীপের একটা দোকানে কাজ করতাম আমি। সেখানে আমার বেতন ছিল মাসে ১৩০ ডলার। তবে আমার যাবতীয় খরচ বহন করত চাকরিদাতা। সে কারণে আমার পুরো বেতনই দেশে পাঠাতে পারতাম। দুই বছরের ভেতরে সব ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি। আমার স্বপ্ন ছিল আরও বেশি বেতনের একটা চাকরি যোগাড় করা। সে কারণে দোকানে কাজ করার সময়ই এক বন্ধুর সহযোগিতায় রান্নার কাজটাও শিখে ফেলি। পরবর্তীতে সেই বন্ধুর সাহায্যেই পাঁচ-তারকা হোটেলে একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়। এই নতুন চাকরিতে বেতন পেতাম প্রতি মাসে তিনশ ডলার। এখানেও আমার যাবতীয় খরচ বহন করতো চাকরিদাতা। সুতরাং পুরো বেতনই দেশে পাঠাতাম।

হোটেলের কাজে আরও দক্ষ হয়ে উঠলে আবারও চাকরি পরিবর্তন করি। তবে এবার একটি রিসোর্টে। এই রিসোর্টে আমি বারো বছর কাজ করার পর দেশে এসেছি ২০১৬ সালে। আমার পাঠানো টাকা দিয়ে আমার পরিবার গ্রামে একটা তিন তলা বাড়ি করেছে। বিয়ে হয়ে গেছে আমার বড় মেয়ের। ছেলে এইচএসসি পাশ করেছে। সে এখন একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে সুপারভাইজার হিসেবে। ছোট ছেলেকে সিএনজি চালিত একটা বেবি ট্যাক্সি কিনে দিয়েছি। নিজেই সেটা চালায়। ছোট মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী। কিছু টাকা বিনিয়োগ করেছি আমার গ্রামে একটা মাছের প্রকল্পে। বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছি। কোনো বড় ধরনের কাজ এখনও শুরু করি নাই। অন্যদিকে মালদ্বীপের যে রিসোর্টে কাজ করতাম তাদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে। ইচ্ছা করলে সেখানে আগের চাকরিতে ফিরে যেতে পারি কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নেই নাই।

ঠকবাজ দালালকে ছাড়বো না

মোহাম্মদ শিকদার হোসেন

টাঙ্গাইল জেলার বিলগারদিনা গ্রামে আমার বাড়ি। বয়স ৩২ বছর। আমি একজন ফেরত-আসা অভিবাসী। আমার বাবা একজন গরিব মানুষ এবং তিনি আমাকে বিদেশ পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু আমি আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশ যেতে চাইতাম। সে কারণে একজন দালালের সঙ্গে কথা বলি। সে আমাকে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী

করে তোলে। তাকে আমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই এবং সে বাবাকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়। আমার বাবা দালালকে দুই লাখ ৭০ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়। দালাল আমাকে মালদ্বীপের একটা হোটেলে মাসিক ৩০ হাজার টাকার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পাশাপাশি জানায় ওখানে আমার থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার জন্য কোনো টাকা খরচ করতে হবে না। বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে ২০১৪ সালের ১৫ জুন টাকাটা দালালকে দেওয়া হয়। সে আমার পাসপোর্ট ও ১২ কপি ছবিও নেয়। এর কয়েকদিন পর আমি মালদ্বীপে চলে যাই। সেখানে পৌঁছানোর পর দালালের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনো কাজ পাই না। পরবর্তীতে মালদ্বীপে অন্য এক দালাল আমাকে সহজে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে চায়। কিন্তু সেজন্য দুই লাখ টাকা দাবি করে। বাবাকে বিষয়টা জানালে তিনি দেশের দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দালাল দুইশ টাকার স্ট্যাম্পে "বিষয়টা সমাধান করা হবে"- এরকম একটা অঙ্গীকারনামা তৈরি করার পর স্বাক্ষর করে। কিন্তু সে এ ব্যাপারে আর কিছুই করে নাই।

অন্য কোনো উপায় না থাকায় জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি এবং আমার বাবা তখন দালালের মুখোমুখি হলে সে আবার প্রতিশ্রুতি দেয় আমাকে সে আবার মালদ্বীপ পাঠাবে অথবা টাকা ফেরত দেবে। আমার আর মালদ্বীপ যাওয়া হয় নাই। আরও একবার দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে জানায় টাকা সে ফেরত দিতে পারবে না। আমার বাবা হতভম্ব হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত রামরু'র এক অংশীদার সংস্থা আরপিডিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে দালালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছি। মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। ঠকবাজ দালালকে আমি ছাড়বো না।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন ও বাস্তবতা বইতে উপস্থাপিত অভিবাসীর সুখ দুঃখের গল্পগুলো বেশ কিছু পুরানো প্রশ্ন আবার নতুন করে উত্থাপন করছে। আবারও স্পষ্ট হলো যে, সমস্যা শুধু গন্তব্য দেশেই নয়, বাংলাদেশের ভেতরেও অনেক রয়েছে। বাংলাদেশে শ্রম অভিবাসন পরিচালনার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে নতুন নীতিমালা ও আইন। এমনকি অভিবাসন ব্যয় বহনকল্পে স্বল্প-সুদে ঋণের সুযোগ দেবার জন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অভিবাসনকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। তারপরও অভিবাসীদের বক্তব্যে বারবারই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এসব আইন ও নীতিমালার সাথে বাস্তবে অভিবাসন যেভাবে পরিচালিত হয় তাতে রয়েছে বিশাল অসঙ্গতি।

সর্বপ্রথম অসঙ্গতি হল এখন পর্যন্ত দালালেরাই অভিবাসনের প্রধান সওদাগর। দালালরা সহযোগিতা না করলে বর্তমান ব্যবস্থায় খুব অল্পসংখ্যক লোকের কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করবে। অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণের প্রতিটি পর্যায়ে সেবা দিচ্ছে তারা, অভিবাসনের স্বপ্ন বিক্রি দিয়ে শুরু তারপর ভিসার সংবাদ প্রদান, রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ ঘটানো, সম্ভাব্য কর্মীর পাসপোর্ট সংগ্রহ করে রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে পৌছে দেয়া, ইন্টারভিউ এর জন্য নিয়ে আসা, বিএমইটি রেজিস্ট্রেশনের এর ব্যবস্থা করা, বিএমইটির ছাড়পত্র হয়ে গেলে তা আবার সম্ভাব্য কর্মীর কাছে পৌঁছে দেয়া, ওয়ার্কপারমিট হয়ে গেলে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসা - সবগুলো পর্যায়ে পাশে থাকে দালাল। একদিকে তার সেবা ছাড়া অভিবাসন সম্ভব নয়; অন্য দিকে সে কাজ করে পর্দার অন্তরালে থেকে। এই অবস্থার কারণে তৈরী হয়েছে শঠতার সুযোগ। অনেক গল্পেই আমরা দেখেছি টাকা দিয়ে বিদেশ যেতে পারেনি বহু অভিবাসী, আবার যে কাজের জন্য বিদেশ গেছে সেই কাজ পায়নি। অসময়ে বিনা বেতনে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে অনেকেই। এসব বিষয়ে গণভাবে দালালকে দোষারোপ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ভুল থাকে রিক্রুটিং এজেন্সির। সরকারও তার দায়ভার এড়াতে পারে না কারণ, এই অন্যায়গুলো প্রতিরোধ করা সরকারের দায়িত্ব। দালাল এবং রিক্রুটিং এজেন্সিদের একত্রে দায়বদ্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে নাগরিক সমাজ পেশ করেছে দুটি সম্ভাব্য বিকল্প: হয়, দালালদের নিবন্ধিত করে বৈধতা দেয়া হোক এবং তারা জালিয়াতি করলেই শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, নতুবা যারা লাইসেন্স ছাড়া অভিবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক।

জালিয়াতি করলে সেই অর্থ সালিশের মাধ্যমে অভিবাসীকে আদায় করে দিতে সরকারের কার্যক্রম রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিএমইটি এই সালিশ করছে। রামরুও মাঠপর্যায়ে মধ্যস্থতার

মাধ্যমে কিছু অর্থ অভিবাসীদের ফেরত পেতে সাহায্য করছে। কিন্তু অভিবাসীরা যা ফেরত পাচ্ছে তা তাদের দেয়া অর্থের ৩ ভাগের ১ ভাগও নয়। ২০১৩ সালের অভিবাসন আইন সৃষ্টির পরে আশা করা হয়েছিল যে দেশের বিভিন্ন আদালতে এই আইনের অধিনে মামলা রুজু করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সরকার দালালদের অথবা রিক্রুটিং এজেন্সীদের তাদের অন্যায় কর্মের আইনী দন্ড দেয়ার ক্ষেত্রে তেমন অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ এখনও নিতে পারে নি। সত্যি বলতে কি প্রতারণাপূর্ণ কর্মকান্ডের জন্য দালালের অথবা রিক্রুটিং এজেন্সীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তাতে তাদের শাস্তি হয়েছে এমন সাক্ষ্য - প্রমাণ খুবই অল্প। অভিবাসীদের এই গল্পগুলো হয়তো আইন প্রণেতাদের নাড়া দেবে।

অভিবাসনের দেশে, অভিবাসীদের উপর সংগঠিত শঠতা ও নিগ্রহ সম্পর্কে শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলো যে একেবারেই ওয়াকিবহাল নয় তা কিন্তু নয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম-গ্রহণকারী কিছু দেশ উপলব্ধি করছে যে, তাদের শ্রমিক সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে সমস্যা রয়েছে। কাতার তাদের 'কাফালা' পদ্ধতিকে পুনর্গঠন করেছে, কুয়েত গৃহকর্মীর সর্বনিম্ন বেতন ধার্য করেছে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত গৃহকর্মীর দায়িত্ব দিচ্ছে শ্রম মন্ত্রণালয়কে, যে দায়িত্ব এতকাল ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। দীর্ঘদিন ধরে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা চলছে উৎস ও গন্তব্য দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে। এই চুক্তি মূলত গ্রহীতা দেশের পক্ষেই যায়। অভিবাসীরা এর ফল কমই পায়। তাছাড়া দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার অধীনে যে বেতন বা কর্ম অধিকার দেয়া হয় তা বাস্তবায়ন করা যায় না। বহুকর্মীর সাথে নতুন করে কম বেতনে আবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বহু কর্মী অসময়ে প্রত্যাবর্তন করে শূণ্য হাতে।

নারী অভিবাসীদের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। যেসব নিগ্রহের চিত্র এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে অনেকেই ভাবতে পারে যে, এই পরিস্থিতিতে নারীকে কাজের জন্য উপসাগরীয় দেশে যেতে না দেয়াই ভালো। কিন্তু অতীতে আমরা দেখেছি নারী অভিবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেই নারী অভিবাসন বন্ধ হয়ে যায় না, বরং তা মানবপাচারকে উৎসাহিত করে। এমতাবস্থায় অভিবাসনের দেশে গৃহের অভ্যন্তরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বহুপাক্ষিক ফোরামে বিশেষ কিছু মানদন্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া অভিবাসনের দেশে আমাদের সরকারের প্রয়োজন খবরদারির জন্য উপযুক্ত লোকবল এবং অর্থ সংকুলান।

বেতন, কাজের সময়সীমা, বসবাসের পরিবেশ এবং শ্রমিক সংগ্রহের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে একটা শ্রমের নূন্যতম সাধারণ মানদন্ড নির্ধারণ করা গেলে তা উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশের জন্যই লাভজনক হবে, লাভবান হবে শ্রমিকরাও।

দ্বিপাক্ষিকতার অসুবিধাগুলো বুঝে এ গ্রন্থে আমরা দাবী করছি বিষয়টি বহুপাক্ষিক ফোরামে নিয়ে আসার জন্য। বহুপাক্ষিকতাই হলো একমাত্র উপায় যা ত্রুটিপূর্ণ অভিবাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করতে পারে। জাতিসংঘ এসব জটিল বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গঠন করেছে 'গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট (জিএফএমডি)'। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জিএফএমডি'র সুপারিশমালা এখনও পুরোপুরি শর্তহীন। এটি মানতে কোন

রাষ্ট্রই বাধ্য নয়। পরবর্তী কয়েক বছরে জিএফএমডি-এর লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রমের নূন্যতম সাধারণ মানদন্ড ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা এবং উৎস ও গন্তব্য দেশগুলি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যেন সে সব মেনে চলে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা। জাতিসংঘ ২০১৫ সালে তার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, যার শিরোনাম 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস ২০৩০ (এসডিজি)'। সেখানে একটা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য হিসেবে অভিবাসন আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এটি একটি লক্ষ্য বলে মর্যাদা পায়নি। তা সত্তেও এসডিজি তার ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের সম্ভাব্য অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেখানে অভিবাসনের বিষয়টি উল্লিখিত ও সংযোজিত হয়েছে ১৪, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদে, উপরন্তু লক্ষ্যগুলি বর্ণিত হয়েছে ৮.৭, ৮.৮, ১০.৭ এবং ১৭.৮ অনুচ্ছেদে। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জন করতে হলে অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে অবশ্যই 'অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসীসহ সকল শ্রমিকের জন্য সুরক্ষিত ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ' নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ পর্যালোচনা

অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন এবং বাস্তবতা বইটি সমসাময়িক কালের একটি অমূল্য প্রাসঙ্গিক রচনা। বইটির বিষয়বস্তুতে সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশী স্বল্পমেয়াদী অভিবাসীদের অভিবাসনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে যা আমাদের সাহিত্য জগতেও একেবারেই অনুপস্থিত। দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসীদের নিয়ে বিদেশে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। যেমন, ১৯৮০-র দশকে ভারতী মুখোপাধ্যায় কানাডায় বসবাসরত অভিবাসীদের গল্প সমগ্র হিসেবে লেখেন ডার্কনেস। পরবর্তীতে তিনি দক্ষিণ-এশীয়দের যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরের উপর দ্য মিডলম্যান এন্ড আদার স্টোরিজ নামে বই লিখেছিলেন। তার কাছাকাছি সময়ে অমিতাভ ঘোষ আন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিবাসন নিয়ে দ্য সার্কেল অব রিজন এবং শ্যাডো লাইনস এর মতো উপন্যাস লিখেছেন। এরও কিছুদিন পর ২০০৩ সালে মনিকা আলী লন্ডন প্রবাসী কিছু সিলেটী অভিবাসীর জীবন নিয়ে একটি বই লেখেন। কিরণ দেসাই ২০০৬ সালে নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের নিয়ে তার বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত বই দ্য ইনহেরিটেন্স অব লস রচনা করেছেন।

তবে মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কর্মরত আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ বাংলাদেশী অভিবাসীদের কথা এখনও পর্যন্ত লেখা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে তথ্যচিত্রের আদলে লেখা *অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন এবং বাস্তবতা* বইটি এ ধরনের অভিবাসীদের জীবন ও কর্ম তুলে ধরার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। বইটিতে পুরুষ এবং মহিলা অভিবাসীদের জীবনকাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব স্বল্প-শিক্ষিত অভিবাসীরা নতুন দেশে, নতুন সমাজে কীভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন বা নিতে পারেননি তার অভিজ্ঞতাগুলো বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী কিছু নিবেদিত বাংলাদেশী এবং কানাডিয়ান গবেষকদের সাথে নিয়ে *অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন এবং বাস্তবতা* রচনা করেছেন। বইটি রামরু'র একটি নিজস্ব প্রকাশনা। রামরু এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি বাংলাদেশী অভিবাসীদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃত হিসেবে অবদান রাখছে। এই বইটি গবেষণামূলক বইয়ের থেকেও বেশি কিছু, এবং আমাদের জন্য প্রামাণিক বই। সবারই এটি পড়া উচিত। সর্বোপরি, এটি সহজবোধ্য এবং এতে প্রবাসীদের জীবনধারার বর্ণনা রয়েছে, যা সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞদেরও ভালো লাগবে।

অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন এবং বাস্তবতা বইটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যা থেকে পাঠক অভিবাসীদের জীবন, তাদের দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার কারণ, মানসিক যাতনা,

হতাশা ইত্যাদি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি অভিবাসনের ইতিবাচক দিকগুলো সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে।

যদিও বাংলাদেশী অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি মূল্যবান বই তবু এর কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। যেমন গল্পগুলো প্রায় একই দৈর্ঘ্যের এবং এগুলো অভিবাসীদের জীবনের একই রকম সংক্ষিপ্ত বর্ননা। যদি কিছু গল্পে অভিবাসীদের জীবনবৃত্তান্ত আরও ব্যাপকভাবে তুলে আনা যেত তাহলে গুণগতমান আরও বাড়তো। এছাড়াও, সংক্ষিপ্ত আকারে গল্প বর্ণনার ধরণ পাঠককে এক ঘেয়ে করে তুলতে পারে ফলে পরবর্তী কাহিনীতে যেতে পাঠকের আগ্রহ কমে যেতে পারে। সংগৃহীত কাহিনীগুলোর তাৎপর্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের জন্য সুপারিশমালা নিয়ে শেষের দিকে কোনো একটি অধ্যায়ে আলোচনা থাকলে পাঠকরা আরও উপকৃত হতে পারতেন। বইটির আরেকটি সমালোচনা হচ্ছে যে, এটি শুধুমাত্র শ্রম অভিবাসীদের গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি শ্রম অভিবাসীদের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত দীর্ঘমেয়াদি অপেক্ষাকৃত স্বাবলম্বী বাংলাদেশীদের গল্প আনা যেত তাহলে বইটি আরও বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো।

তারপরও *অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন এবং বাস্তবতা* বইটি বাংলাদেশী অভিবাসীদের জীবন সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। এই বইয়ের গল্পগুলো সত্য এবং পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের করুণ বাস্তবতার সাথে; এবং এগুলো অভিবাসীদের স্বপ্নপূরণ এবং স্বপ্নভঙ্গের গল্প। সমস্যায় জর্জরিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করার গল্প। বাংলাদেশী অভিবাসীদের অভিজ্ঞতার পটভূমি জানার জন্য এটি একটি মূল্যবান বই।

ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ

বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

প্রথমেই আমি আমার দুই সহযোদ্ধা ড. সি আর আবরার এবং ড. তাসনিম সিদ্দিকীকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, যাদের সাথে গত ২০ বছর ধরে বাংলাদেশের অভিবাসীদের অধিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একত্রে কাজ করার মধুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ বইটিতে পুরুষ ও নারী অভিবাসী- যারা সমাজের সৌভাগ্যবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না, তাদের বিচিত্র অভিবাসন অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

শাহানা খাতুন নামের নারীটির কথা আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং জর্ডানে ছিলেন। তার বিদেশে অবস্থানের সময়কাল, অভিবাসীকর্মী ও তাদের পরিবারের সকল সদস্যেদের অধিকার বিষয়ক ইউএন কনভেনশন ১৯৯০ তৈরী এবং দীর্ঘসময় ধরে তা অনুসমর্থনের জন্য সরকারের সাথে আমাদের এ্যাডভোকেসির সময়কালের সাথে মিলে যায়। সেই সময় থেকেই আমরা সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম অভিবাসন সম্পর্কিত ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ রহিত করে নতুন আইন সৃষ্টি করার জন্য। একই সময় আমরা শুরু করেছিলাম ১৯৮২ সালের অভিবাসন অধ্যাদেশ পরিবর্তনের কার্যক্রম।

১৯৯০ সালের কনভেনশন থেকে নতুন যেসব বাধ্যবাধকতা তৈরি হলো সে অনুসারে জাতীয় আইন তৈরি করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ২০১৩ সালের অভিবাসন আইন সেই প্রচেষ্টারই ফসল। আশা করি কেউ শীঘ্রই শাহানা খাতুনের গল্পটি নিয়ে গবেষণা করবেন এবং আমাদের সফলতা ও বিফলতার স্বরূপ বুঝে কোনো পথে হাঁটা উচিৎ তা দেখিয়ে দেবেন। গল্পটি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।

আরেকটি বিষয়ও আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে, তা হলো ভারতে অভিবাসন। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিবাসন কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কিংবা সরকারি অবকাঠামো ছাড়াই ঘটে থাকে। এটি মূলত ঘটে শ্রম অভিবাসীদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। এ দুই দেশের মধ্যকার অভিবাসন বিষয়ে আরও বিশদভাবে কাজ হোক এটাই আমার প্রত্যাশা। ভারতে অভিবাসনের পাঁচটা ঘটনাই মহিলা অভিবাসী সম্পর্কিত। এর সাথে কিছু পুরুষদের অভিজ্ঞতা যুক্ত করলে আরও ভালো হতো। আশা করি রামরু ভবিষ্যতে এ বিষয়টির ওপর নজর দেবে।

আবারো বলছি, শুধুমাত্র শ্রম-অভিবাসী-কর্মীদের না বলা কথাগুলো নিয়েই এ বইটি রচিত। সকল ধরনের আর্থ-সামাজিক শ্রেণীভুক্ত অভিবাসী যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অভিবাসন করেছেন এর মধ্যে অনেকেই হয়ত ডায়াসপোরা হিসেবে বসবাস করছেন এমন মানুষদের নিয়ে রামরু এরকম আরও প্রকাশনা বের করবে এমন প্রত্যাশা রইল।

কমন ল'এর পরিসরে এবং পেশায় আমি একজন আইনজীবী ও পরবর্তীতে একজন বিচারক। এই সুবাদে বলতে পারি এ বইটি আইনজীবী ও বিচারপতিদের জন্য নজির হিসেবে কাজ করবে। বইটিকে আমি কেইস ল' হিসেবে ধরছি। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আইন তৈরিতে বা বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদানে বইটি কাজে লাগতে পারে। আনন্দের কথা হলো অভিবাসন বিষয়ে আমাদের দেশে "অভিবাসী আইন ২০১৩" রয়েছে। আইনটি একইসাথে কিছু নীতি দ্বারা সম্পূরক ও পরিপূরক। "অভিবাসী আইন ২০১৩"-র অধীনে কোনো মামলা হলে বইটি অনবদ্য নজির হয়ে কাজ করবে। এ কারণেই আমি এ বইটি নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহী। রামরুকে অশেষ ধন্যবাদ। ভবিষ্যৎ প্রয়াসের জন্য শুভকামনা রইল।

অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান

ভাইস চ্যান্সেলর, সেন্ট্রাল ওমেন্স ইউনিভার্সিটি

কয়েক সপ্তাহ আগেই আমাকে *অভিবাসীর অকথিত গল্প: স্বপ্ন এবং বাস্তবতা* বইটি পর্যালোচনা করতে বলা হয়। এটি রামরু'র একটি প্রকাশনা। প্রকাশক আমাকে প্রতিটা দেশের কয়েকটি করে গল্প পড়ে আমার মতামত প্রদানের জন্য বলেন। আমি কিছুটা উদ্বেগ নিয়েই বইটি পড়া শুরু করি। কিন্তু পড়তে যেয়ে এতটাই আকৃষ্ট হই যে পুরো বইটাই পড়ে ফেলি। বইটিতে গত বিশ বছর ধরে রামরু'র পরিচালিত কেস স্টাডি থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ কিছু গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকাশিত বইটি জীবন, স্বপ্ন ও বাস্তবতার একটি অসাধারণ মিশ্রণ যেখানে উপসাগরীয় এলাকা, দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়াতে স্বল্প-দক্ষ পুরুষ ও নারী কর্মীদের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়ার গল্পগুলো ফুটে উঠেছে। অভিবাসন প্রক্রিয়া যে কতো জটিল তা এই গল্পগুলো থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাদের জীবন দুঃসাহস আর অর্জনে পরিপূর্ণ। অভিবাসন করতে গিয়ে ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন এমন গল্পও এখানে রয়েছে। আবার কিছু গল্পে ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও কাজের অমানবিক পরিবেশের কথা উঠে এসেছে। এখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ গল্পই নারী অভিবাসীদের নিয়ে। নারীদের গল্পগুলোতে একদিকে আছে অসহায়ত্ব এবং অন্যদিকে আছে ক্ষমতায়ন।

আমি যে শ্রেণীর লোকজনকে চিনি গল্পগুলো সে শ্রেণীর মানুষের না। প্রতি বছর আমি যখন বিদায়ী ব্যাচের শেষ ক্লাশ নেই, শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জনের পরে তারা কী করতে চায়? তাদের বেশির ভাগই দেশের বাইরে চলে যেতে চায় বলে জানায়। আমি জানতে চাই তারা কেন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় অংশ নিতে চায় না। তারা জানায় প্রচলিত কোটা ব্যবস্থার কারণেই এরকম পরীক্ষাগুলো থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে ছাত্ররা বিদেশমুখী হয়ে পড়ছে। একজন শিক্ষক হিসেবে বিষয়টা আমাকে পীড়া দেয়। কিন্তু এটাই বাস্তবতা।

এ বইয়ের নায়ক নায়িকারা পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পাননি। তাদের অধিকাংশই এসএসসি-ও পাশ করেননি কিংবা কোনো ভকেশনাল ট্রেনিংও নেননি। বেশিরভাগ অভিবাসীই সমাজের নিচু স্তর থেকে এসেছেন, যাদের দেশের ভেতরে কাজের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতার মাধ্যমে শ্রেনী উত্তরণের কোন সুযোগ নেই।

গল্পগুলো এটাই প্রমান করে যে সমস্যাগুলো শুধুমাত্র গন্তব্য দেশেরই নয়, বাংলাদেশ থেকেই সমস্যাগুলোর উৎপত্তি। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচলিত দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থাপনার চেয়ে বহু-পাক্ষিক ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এ বইটিতে।

কিছু গল্প পড়তে ভালো লেগেছে যেখানে তারা গর্ব নিয়ে সফলতার কথা বলেছেন। মো: মাইনুল নামের একজন কুয়েত থেকে বেশ কিছু পুঁজি নিয়ে ফেরত এসেছেন এবং এখানেও প্রায় ৫০ হাজার টাকা করে রোজগার করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পোলট্রি বা মৎস্য চাষের মতো ছোট ব্যবসা

শুরু করছেন। এতে নিজের এলাকাতে অন্যদের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দেয়া যায়। পরিবার আমাদের জীবনে অনেক বড় একটা অংশ। অভিবাসীরা তাদের বাবা-মা, ভাইবোনদের ভালোর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেণ তা গল্পগুলোতে ফুটে উঠেছে। একটি গল্পে 'আমার বাবার আর মাঠে কাজ করতে হয় না' শীর্ষক শিরোনামটি আমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে।

পরিশেষে আমি রামরু-কে এ অসাধারণ কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। যে কোনো পাঠকের কাছেই বইটি একই সাথে তথ্যবহুল এবং সুবোধ্য মনে হবে। বইটি অভিবাসনের ক্ষেত্রে পর্দার আড়ালে থাকা নায়ক নায়িকাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবে।

“কমন ল’ এর বিচার ব্যবস্থার দৃষ্টিকোন থেকে ২০১৩ সালের আইন প্রয়োগে এই বইটি হবে একটি কেইস ল।”

- বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ

“বইটি সমসাময়িক কালের অভিবাসীদের নিয়ে একটি অমূল্য প্রাসঙ্গিক রচনা।”

- অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম

“এই বইটি পর্দার আড়ালে থাকা অভিবাসী নায়ক ও নায়িকাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবে।”

- অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান

RMMRU

PROKAS
Promoting Knowledge for Accountable Systems

BRITISH COUNCIL

UKaid
from the British people